لا اله الا الله محمد رسول الله

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

THE AHMADI

Fortnightly

নব পর্যায়ে ৫৪তম বর্ষ ।। ২০শ সংখ্যা

৮ই জেলকদ, ১৪১৩ হিঃ ।। ১৭ই বৈশাখ, ১৪০০ বঙ্গাব্দ ।। ৩০শে এপ্রিল, ১৯৯৩ইং

বার্ষিক চাঁদা ঃ বাংলাদেশ ৭২.০০ টাকা ।। ভারত ২ পাউণ্ড ।। অন্যান্য দেশ ১৫ পাউণ্ড ।।

সূচীপত্র

পাক্ষিক আহমদী — ২০শ সংখ্যা (৫৪তম বর্ষ) — পৃঃ

তরজমাতুল কুরআন (সংক্ষিপ্ত তফসীরসহ)
আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত কর্তৃক প্রকাশিত কুরআন মজীদ থেকে ১

হাদীস শরীফ ঃ সময়ানুবর্তিতা
অনুবাদ ঃ মাওলানা সালেহ আহমদ, সদর মুরব্বী ৩

অমৃত বাণী ঃ হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ))
অনুবাদ ঃ জনাব নাজির আহমদ ভূঁইয়া ৪

জুমুআর খুত্‌বা
হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)
অনুবাদ ঃ মাওলানা সালেহ আহমদ, সদর মুরব্বী ৯

নামাযে রুকু সিজদা ইত্যাদির তাৎপর্য
অনুবাদ ঃ জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান ১৩

খোলা চিঠি
জনাব আহমদ সেলবর্সী ১৭

যে দেশে রাজাকার বড়
জনাব মুনতাসীর মামুন ১৯

কেন আহমদী হলেম
জনাব সরফরাজ এম, এ, সাত্তার রঙ্গু চৌধুরী ২৩

পাকিস্তানী ভূত ঘাড় থেকে নামানো
জনাব আবদুস সামাদ ২৯

ছোটদের পাতা
চাকোলেট চুইংগাম (বিজ্ঞান-ভিত্তিক রম্য-রচনা) ৩৩

সংবাদ ৩৬

সম্পাদকীয় ঃ

বিশেষ সম্মান লাভ

আল্লাহ্‌তা'লার বিশেষ ফযলে ইন্টারন্যাশনাল বায়োগ্রাফিকাল সেন্টার কর্তৃক সেলসেলা আলীয়া আহমদীয়ার (১) হযরত শেখ মহাম্মদ আহমদ মযহার, আমীর ফয়সলাবাদ জামা'ত, (২) মোহতরম মির্যা আবদুল হক, প্রাদেশিক আমীর পাঞ্জাব ও (৩) মাওলানা দোস্ত মোহাম্মদ শাহেদ, ইতিহাসবিদকে ম্যান অব দি ইয়ার (৯২-৯৩)-এ ভূষিত করা হয়েছে। আলহামদু-লিল্লাহ্‌। এখানে উল্লেখ থাকে যে, প্রতি বছর ১০ হাজার নাম করা ব্যক্তিত্বের মধ্য থেকে বাছাই করে এ সম্মানে ভূষিত করা হয়।

(দৈনিক আল ফযলের ১৪-৪-৯৩ তারিখের পত্রিকার সৌজন্যে)

وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

৫৪তম বর্ষ : ২০শ সংখ্যা

৩০শে এপ্রিল, ১৯৯৩ : ৩০শে শাহাদাত, ১৩৭২ হিঃ শামসী : ১৭ই বৈশাখ, ১৪০০ বঙ্গাব্দ

কুরআন মজীদ

সূরা আল্‌ বাকারা—২

২৬৭। তোমাদের মধ্যে কেহ কি ইহা চাহে যে, তাহার জন্য খর্জুর ও আঙ্গুরের এমন একটি বাগান থাকুক, যাহার তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত থাকে, উহাতে তাহার জন্য সর্বপ্রকার ফল থাকে অতঃপর তাহাকে বার্ধক্য আসিয়া আক্রমণ করে এবং তাহার দুর্বল সন্তান-সন্ততি থাকে; এমন সময় সেই বাগানের উপর দিয়া এক অগ্নিময় ঘূর্ণিঝড় বহিয়া যায়, ফলে উহা পুড়িয়া ভস্মীভূত (৩৩৬) হইয়া যায়? এইরূপে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য নিদর্শনাবলী সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন যেন তোমরা চিন্তা করিয়া কাজ কর। ৩৬ রুকু

২৬৮। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা খরচ কর পবিত্র বস্তু হইতে যাহা তোমরা উপার্জন কর, এবং উহা হইতেও যাহা আমরা তোমাদের জন্য যমীন হইতে উৎপন্ন করি, এবং তোমরা এমন নিকৃষ্ট বস্তুর সংকল্প করিও না, যাহা হইতে তোমরা খরচ কর বটে, কিন্তু তোমরা স্বয়ং চক্ষু বন্ধ না করিয়া আদৌ উহা (৩৩৭) গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহ। এবং জানিয়া রাখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ স্বয়ংসম্পূর্ণ-ঐশ্বর্যশালী, সকল প্রশংসার যোগ্য।

৩৩৬। এই উপমা দিয়া, মুসলমানকে সতর্ক করা যাইতেছে যে, তাহারা যদি লোক দেখানোর জন্য দান ও খয়রাত এবং আল্লাহ্‌র রাস্তায় টাকা পয়সা খরচ করেন কিংবা দান খয়রাতের পরে উপকৃতদের খোঁটা দিয়া মনঃকষ্ট দেন, তাহা হইলে তাহাদের সমস্ত দান-খয়রাত একেবারে বিফলে যাইবে।

৩৩৭। এই আয়াতে বলা হইয়াছে যে, ন্যায়ভাবে উপার্জিত ভাল ও পবিত্র বস্তু নিজে রাখিয়া, মন্দ বস্তু আল্লাহ্‌র নামে দান করা অনুচিত। ব্যবহৃত বস্তু ইত্যাদি গরীবকে দান করা যাইতে পারে, তাই বলিয়া কেবল ঐগুলিকেই গরীবের জন্য চিহ্নিত করা ধনীদের পক্ষে ঠিক নহে।

২৬৯। শয়তান তোমাদিগকে দারিদ্রের (৩৩৮) ভয় দেখায় এবং সে তোমাদিগকে অশ্লীলতার (৩৩৯) আদেশ দেয়, পক্ষান্তরে আল্লাহ্ নিজ পক্ষ হইতে তোমাদিগকে ক্ষমা এবং ফযলের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ প্রাচুর্যদানকারী, সর্বজ্ঞানী।

২৭০। তিনি যাহাকে চাহেন হিকমত (৩৪০) প্রদান করেন, এবং যাহাকে হিকমত প্রদান প্রদান করা হয়, তাহাকে প্রভূত কল্যাণ প্রদান করা হয়; প্রকৃত বুদ্ধিমান ব্যতীত অন্য কেহ উপদেশ গ্রহণ করে না।

২৭১। এবং যাহা কিছু তোমরা খরচ কর অথবা যাহা কিছু তোমরা মানত কর (৩৪১) নিশ্চয় আল্লাহ্ উহা জানেন; এবং যালেমদের জন্য কোন সাহায্যকারী হইবে না।

৩৩৮। 'ফাকারা' অর্থ 'সে মুক্তার মধ্যে ছিদ্র করিল' 'সে গরীব ও অভাবী হইয়া গেল'; 'ফাকিরা' অর্থ তাহার মেরুদণ্ডের কষ্ট দেখা দিল। অতএব, 'ফকর' মানে 'দারিদ্র্য'; অভাব-দায়গ্রস্ততা; যাহা মানুষের মেরুদণ্ড সোজা হইতে দেয় না: যাহা দুশ্চিন্তা ও অশান্তি দ্বারা মানসিক কষ্ট দেয় (লেইন)।

৩৩৯। শয়তান মানুষের মনে কুমন্ত্রণা যোগায় যে, এত দান-খয়রাত করিলে তো দুই দিনেই ধন-সম্পদ ফুরাইয়া যাইবে এবং দাতা দরিদ্র হইয়া পড়িবে। এই আয়াত শয়তানের এই কুপ্ররোচনাকে, দাতার মনে স্থান দিতে বারণ করে এবং অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করে যে, ধনী ব্যক্তিরা যদি পরোপকারের জন্য মুক্ত হস্তে ব্যয় না করে, তাহা হইলে জাতি অল্প কালের মধ্যেই দরিদ্র হইয়া পড়িবে; আর্থিকভাবে দেশ অবনতির দিকে যাইবে এবং নৈতিক মূল্যবোধ হইতে দেশ বঞ্চিত হইয়া পড়িবে। যে সম্প্রদায়ের গরীব-দুঃখীদের অর্থনৈতিক প্রয়োজন মিটানো হয় না, সেই সম্প্রদায়ের চরিত্র-পতন ঘটে, কেননা জীবন-জীবিকার জন্য তাহারা গর্হিত ও ঘৃণিত পথে অগ্রসর হইতে থাকে। দেশ ও জাতির জন্য ইহা খুবই মারাত্মক অবস্থা।

৩৪০। এই আয়াতটি ইহাই বুঝাইতে চাহে যে, আল্লাহ্র পথে, পরের উপকার সাধনের উদ্দেশ্যে, ব্যয় করার জন্য ধনীদের প্রতি আল্লাহ্র দেওয়া এই নির্দেশটি অত্যন্ত প্রজ্ঞাময় ও বুদ্ধিমত্তাপূর্ণ। কেননা জাতির উন্নতি ও অগ্রগতির চাবিকাঠি এই নির্দেশ পালনের মধ্যে নিহিত আছে।

৩৪১। হাদীসে আছে রসূলে আকরাম (সাঃ) বাধ্যতামূলক নহে এমন কোন সৎকর্ম করার জন্য শর্তযুক্ত শপথ করা অনুমোদন করেন না। কিন্তু যদি কেহ নিজ হইতে এইরূপ শপথ করিয়া ফেলে, তবে তাহা পূরণ করা তাহার জন্য বাধ্যতামূলক হইয়া যায়।

হাদিস শরীফ

সময়ানুবর্তিতা

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা : মাওলানা সালেহ আহমদ
সদর মুরব্বী

কুরআন শরীফ :

إن الصلوة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ۝ (النساء ايت : ١٠٤)

অনুবাদ : নিশ্চয় নির্ধারিত সময়ে নামায কায়েম করা মোমেনদের উপর ফরয। (নিসা : ১০৪ আয়াত)

إن رجلا قال لابن مسعود رضى الله عنه اى العمل افضل قال سألت عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الصلوة على مواقيتها (بخارى)

অর্থাৎ একজন ব্যক্তি হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ কাজটি সবচেয়ে উত্তম, হযরত ইবনে মাসউদ উত্তর দিলেন, আমি এই প্রশ্নটি হযরত নবী করীম (সাঃ)কে করেছিলাম। তিনি বলেন, সময় মত নামায পড়া সবচেয়ে উত্তম।

ব্যাখ্যা : নামায আল্লাহ্ এবং বান্দার মধ্যে সংযোগ স্থাপনের একমাত্র মাধ্যম। ইহাই ধর্মের মূল ও সারাংশ। একাগ্রচিত্ততা, শৃঙ্খলার অনুবর্তিতা, সময়ের অনুবর্তিতা, পবিত্রতা, আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান করা, খোদার নৈকট্য লাভে উন্নতি করা, নামায এ সব বিষয়াবলী মুসলমানদিগকে শিক্ষা দেয়।

যখন মানুষ আল্লাহ্‌র সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্য সময়ের অনুবর্তিতার যে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে তখন মানবিক জীবনে সময়ের মূল্য আরও বেশী বেড়ে যায়। উন্নতির শিখরে পৌঁছতে হলে সময়ের অনুবর্তিতাই হলো চাবি-কাঠি।

আধ্যাত্মিক জগতের সকল আচার অনুষ্ঠান নির্দিষ্ট সময়ের সাথে সম্পর্কিত। এমতাবস্থায় বাস্তব জীবনে সময়ের প্রতি নিষ্ঠাবান না হলে খোদার নৈকট্য লাভও সম্ভব নয়।

আমাদের জীবনে সময়ের ব্যাপারে এখনও ততটুকু গুরুত্ব দেয়া হয় না যতটুকু দেয়া প্রয়োজন। জামা'তের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এ ব্যাপারে অবহেলা পরিলক্ষিত হয়। তাই আসুন যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা ও হযরত নবী করীম (সাঃ) আমাদিগকে সময়ের অনুবর্তিতার সম্বন্ধে বলেছেন আমরা যেন সেভাবেই সময়কে মূল্যায়ণ করে তা আমাদের জীবনে বাস্তবায়িত করি। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে তৌফীক দান করুন, আমীন।

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর

অমৃতবাণী

অনুবাদক : নাজির আহমদ ভূঁইয়া

(১৯শ সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর)

(আত্মহত্যার) উদ্দেশ্য তো ইহাই ছিল যে ঈসার মান্যকারীরা পাপ, জড়বাদিতা ও দুনিয়ার লোভ-লালসা হইতে বিরত হইয়া যাইবে। কিন্তু ফলাফল বিপরীত হইল। এই আত্মহত্যার পূর্বে ঈসার মান্যকারীরা কিছুটা হইলেও খোদামুখী ছিল। কিন্তু ইহার পর আত্মহত্যা ও প্রায়শ্চিত্তের বিশ্বাসের উপর যতখানি জোর দেওয়া হইল ঠিক ততখানি খৃষ্টান জাতির মধ্যে জড়বাদিতা, দুনিয়ার লোভ-লালসা, দুনিয়ার কামনা-বাসনা, মদ্যপান, জুয়াবাজী কুদৃষ্টি এবং অবৈধ সম্পর্ক বৃদ্ধি পাইল। ইহার দৃষ্টান্ত এইরূপ যে, একটি খরস্রোতা নদীর উপর একটি বাঁধ দেওয়া হইয়াছিল। অতঃপর ঐ বাঁধ একবার ভাঙ্গিয়া গেল এবং চতুষ্পার্শ্বের সকল পল্লী ও জমীনকে ধ্বংস করিয়া দিল। ইহাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন, কেবল পাপ হইতে পবিত্র হওয়া মানুষের জন্য বড় কথা নহে। হাজার হাজার কীট পতঙ্গ ও পশু-পাখী আছে, যাহারা কোন পাপ করে না। সুতরাং আমরা কি উহাদের সম্বন্ধে এই ধারণা করিতে পারি যে, উহারা খোদা পর্যন্ত পৌঁছিয়া গিয়াছে? অতএব প্রশ্ন এই যে, মসীহ আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতা লাভের জন্য কোন্ প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন? মানুষ খোদা পর্যন্ত পৌঁছার জন্য দুইটি বস্তুর মুখাপেক্ষী। প্রথমতঃ পাপ হইতে বিরত থাকা। দ্বিতীয়তঃ, পুণ্য কর্ম সম্পাদন করা। কেবলমাত্র পাপ পরিত্যাগ করা কোন গুণ নহে। সুতরাং সত্য কথা এই যে, যখন হইতে মানুষের সৃষ্টি হইয়াছে তখন হইতে এই উভয় শক্তি তাহার প্রকৃতিতে বিদ্যমান রহিয়াছে। একদিকে প্রবৃত্তির আবেগ তাহাকে পাপের দিকে টানিয়া নেয় এবং অন্যদিকে খোদা-প্রেমের আগুন, যাহা তাহার প্রকৃতিতে গুপ্ত আছে, তাহা ঐ পাপের খড় কুটাকে এইভাবে পোড়াইয়া দেয় যেভাবে বাহ্যিক আগুন বাহ্যিক খড় কুটাকে পোড়াইয়া দেয়। কিন্তু ঐ আধ্যাত্মিক আগুনে জ্বলিয়া যাওয়া যাহা পাপকে পোড়াইয়া দেয় তাহা খোদার তত্ত্বজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। কেননা প্রত্যেক বস্তুর প্রেম ও ভালবাসা উহার তত্ত্বজ্ঞানের সহিত সম্পৃক্ত। যে বস্তুর সৌন্দর্য ও গুণাবলী সম্পর্কে তোমার জ্ঞান নাই সেই বস্তুর প্রতি তুমি আসক্ত হইতে পার না। অতএব মহা সম্মানিত ও পরাক্রমশালী খোদার গুণাবলী, সৌন্দর্য ও করুণা সম্পর্কে তত্ত্বজ্ঞান তাঁহার প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি করে এবং ভালবাসার

আগুনে পুড়িয়া যায়। কিন্তু আল্লাহ্‌র বিধান এইভাবে জারী রহিয়াছে যে, সাধারণ লোকেরা ঐ তত্ত্বজ্ঞান নবীগণের মাধ্যমে লাভ করিয়া থাকে। তাঁহাদের জ্যোতিতে তাহারা জ্যোতিঃ লাভ করিয়া থাকে এবং তাঁহাদিগকে যাহা কিছু দেওয়া হইয়াছে তাহারা তাঁহাদের অনুবর্তিতায় ঐ সব কিছু পাইয়া থাকে।

কিন্তু আফসোস, খৃষ্ট ধর্মে খোদার তত্ত্বজ্ঞানের দরজা বন্ধ। কেননা খোদাতা'লার সহিত বাক্যালাপের উপর মোহর লাগিয়া গিয়াছে এবং ঐশী নিদর্শনের সমাপ্তি ঘটিয়াছে। তাহা হইলে খাঁটি ও তাজা তত্ত্বজ্ঞান কিসের মাধ্যমে পাওয়া যাইবে? কেবল কেচ্ছা-কাহিনী মুখে আওড়ানোই সার। এইরূপ ধর্মের দ্বারা একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি কি করিবে, যাহার খোদাই কম জোর ও দুর্বল এবং যাহার কেন্দ্রবিন্দু কেচ্ছা-কাহিনীর উপর স্থাপিত।

অনুরূপভাবে হিন্দু ধর্ম, যাহার একটি শাখা আর্য ধর্ম, তাহাও সত্য হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্যুত। তাহাদের মতে জগতের প্রতিটি বস্তু অনাদি, যাহার কোন স্রষ্টা নাই। অতএব হিন্দুদের ঐ খোদার উপর ঈমান নাই, যিনি ব্যতীত কোন বস্তু অস্তিত্বে আসে নাই এবং যিনি ব্যতীত কোন বস্তু প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারে না। তাহারা আরো বলে, তাহাদের পরমেশ্বর কোন কোন পাপ ক্ষমা করিতে পারে না। তাহার নৈতিক অবস্থা যেমন মানুষের নৈতিক অবস্থার চাইতে মন্দ। আমরা আমাদের প্রতি কৃত অপরাধীদের অপরাধ ক্ষমা করিতে পারি। যে ব্যক্তি সরল অন্তঃকরণে নিজের অপরাধ স্বীকার করে এবং নিজের কর্মের জন্য গভীরভাবে অনুতপ্ত হয় এবং ভবিষ্যতের জন্য নিজের মধ্যে এক পরিবর্তন সৃষ্টি করে এবং বিনয় ও দীনতার সহিত আমাদের সম্মুখে অনুশোচনা করে, আমরা খুশী হইয়া তাহার অপরাধ ক্ষমা করিতে পারি, বরং ক্ষমা করিলে আমরা খুশী হই। তাহা হইলে কি কারণে ঐ পরমেশ্বর, যে খোদা হওয়ার দাবী করে এবং যাহার সৃষ্টি পাপী এবং যাহার তরফ হইতে সে পাপ করার শক্তি পায়, তাহার মধ্যে এই উত্তম চরিত্র নাই? কোটি কোটি বৎসর ধরিয়া একটি পাপের শাস্তি না দেওয়া পর্যন্ত এই পরমেশ্বর খুশী হয় না। এইরূপ পরমেশ্বরের অধীনে থাকিয়া কিভাবে কোন ব্যক্তি মুক্তি লাভ করিতে পারে এবং কিভাবে উন্নতি সাধন করিতে পারে?

মোট কথা, আমি খুব গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি যে, এই দুইটি ধর্ম ন্যায়-পরায়ণতার বিরোধী। এই দুইটি ধর্মে খোদাতা'লার পথে যে পরিমাণ প্রতিবন্ধকতা ও হতাশা দেখিতে পাওয়া যায় তাহার সব কয়টি এই পুস্তকে লেখা আমার পক্ষে সম্ভব নহে। কেবল সংক্ষেপে লিখিতেছি যে, ঐ খোদা যাঁহাকে পবিত্র আত্মাগুলি খুঁজিয়া ফিরে, যাঁহাকে পাইলে মানুষ এই জীবনেই সত্যিকারের মুক্তি লাভ করিতে পারে এবং তাঁহার জন্য আল্লা-হুর জ্যোতির দরজা খুলিয়া যাইতে পারে এবং তাঁহার পরিপূর্ণ তত্ত্বজ্ঞানের মাধ্যমে পরিপূর্ণ ভালবাসা সৃষ্টি হইতে পারে, ঐ খোদার দিকে এই দুইটি ধর্ম পথ দেখায় না, বরং ধ্বংসের

কুপে নিক্ষেপ করে। অনুরূপভাবে এই দুইটি ধর্মের সহিত সাদৃশ্যপূর্ণ আরো ধর্ম পৃথিবীতে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই সকল ধর্ম এক-অদ্বিতীয় খোদা পর্যন্ত পৌঁছাইতে পারে না বরং অন্বেষণকারীকে অন্ধকারে ছাড়িয়া দেয়।

এই সকল ধর্ম সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করার জন্য আমি জীবনের একটি বড় অংশ ব্যয় করিয়াছি এবং অত্যন্ত বিশ্বস্ততা ও সততার সহিত ইহাদের নীতি সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করিয়াছি। কিন্তু সবগুলিকে সত্যতা হইতে দূরে এবং সত্যতা বিবর্জিত দেখিয়াছি। হ্যাঁ, এই আশীষমণ্ডিত ধর্ম যাহার নাম ইসলাম, ইহাই একমাত্র ধর্ম যাহা খোদাতা'লা পর্যন্ত পৌছাইয়া থাকে। ইহাই একমাত্র ধর্ম, যাহা মানব প্রকৃতির পবিত্র চাহিদাসমূহ পূরণ করে। বলা বাহুল্য, মানুষের এইরূপ একটি প্রকৃতি আছে, যাহা সব কিছুর মধ্যে পরিপূর্ণতা চাহে। সুতরাং যেহেতু মানুষকে খোদাতা'লার চিরস্থায়ী উপাসনার জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে, সেহেতু সে এই কথার উপর সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না যে, ঐ খোদা যাঁহাকে সনাক্ত করার মধ্যে তাহার মুক্তি, তাঁহাকে সনাক্ত করার জন্য সে কতিপয় অযথা কেচ্ছা-কাহিনীর উপর সীমিত থাকিবে। সে অন্ধ থাকিতে চাহে না। বরং খোদাতা'লার পরিপূর্ণ গুণাবলী সম্পর্কে সে জ্ঞান লাভ করিতে চাহে, যেন সে তাঁহাকে দেখিতে পারে। অতএব তাহার এই আকাঙ্খা কেবল ইসলামের মাধ্যমেই পূর্ণ হইতে পারে। অবশ্য কোন কোন লোকের এই আকাঙ্খা প্রবৃত্তির আবেগের নীচে ঢাকা পড়িয়া আছে। যাহারা পৃথিবীর স্বাদ উপভোগ করিতে চাহে এবং পৃথিবীকে ভালবাসে, তাহারা কঠিন পর্দার অন্তরালে থাকার দরুন খোদার পর্দার না কোন পরোয়া করে এবং না খোদাতা'লাকে অন্বেষণ করে। কেননা পৃথিবীরূপ প্রতিমার সম্মুখে তাহারা মস্তক অবনত করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, যে ব্যক্তি পৃথিবীরূপ প্রতিমা হইতে রেহাই পায় এবং চিরস্থায়ী ও সত্যিকার স্বাদের অন্বেষণ করে, সে কেবল কেচ্ছা-কাহিনীর উপর নির্ভরশীল ধর্মে না সন্তুষ্ট হইতে পারে এবং না তাহা দ্বারা কোন সান্ত্বনা লাভ করিতে পারে। এইরূপ ব্যক্তি কেবল ইসলামেই নিজের সান্ত্বনা লাভ করিবে। ইসলামের খোদা কাহারো জন্য স্বীয় আশীষের দরজা বন্ধ করেন না। বরং তিনি নিজের দুই হস্ত দ্বারা আহ্বান জানাইতেছেন যে, আমার দিকে আস এবং যাহারা পূর্ণ জোরের সহিত তাঁহার দিকে দৌড়ায় তাহাদের জন্য দরজা খুলিয়া দেওয়া হয়।

অতএব আমি কেবল খোদার ফযলে, না আমার কোন গুণের দরুন, এই পুরস্কারের পূর্ণ অংশ লাভ করিয়াছি, যাহা আমার পূর্বে নবী রসূল ও সম্মানিত ব্যক্তিগণকে দেওয়া হইয়াছিল। আমি যদি স্বীয় সৈয়্যদ ও মাওলা, নবীগণের গৌরব, সৃষ্টির সেরা হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের পথের অনুসরণ না করিতাম তবে এই পুরস্কার

লাভ করা আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল। অতএব আমি যাহা কিছু পাইয়াছি এই অনুসরণের জন্যই পাইয়াছি। আমি আমার সত্য ও পরিপূর্ণ জ্ঞান দ্বারা জানি যে, ঐ নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের আজ্ঞানুবর্তিতা ছাড়া কোন মানুষ না খোদা পর্যন্ত পৌঁছিতে পারে না পরিপূর্ণ তত্ত্বজ্ঞানের অংশ লাভ করিতে পারে। এখানে আমি ইহাও বলিতেছি যে, উহা কোন্ বস্তু যাহা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের পূর্ণ আজ্ঞানুবর্তিতার পর সর্ব প্রথম হৃদয়ের জন্য লাভ করে? স্মরণ রাখিতে হইবে যে, উহা সুস্থ হৃদয়। অর্থাৎ ঐ হৃদয় হইতে পৃথিবীর ভালবাসা তিরোহিত হইয়া যায় এবং উহা এক অনন্ত ও স্থায়ী স্বাদের অন্বেষণকারী হইয়া যায়। ইহার পর এই সুস্থ হৃদয়ের দরুন একটি স্বচ্ছ ও পরিপূর্ণ খোদা-অর্জিত হয়। এই সকল পুরস্কার আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের আজ্ঞানুবর্তিতার দরুন উত্তরাধিকার রূপে পাওয়া যায়, যেমন আল্লাহ্‌তা'লা নিজেই বলেন,

قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله (সূরা আলে ইমরান: ৩২)

অর্থাৎ তাহাদিগকে বলিয়া দাও, যদি তোমরা খোদাকে ভালবাস তবে আস, আমার অনুবর্তিতা কর যাহাতে খোদাও তোমাদিগকে ভালবাসেন। বরং একতরফা ভালবাসার দাবী সম্পূর্ণরূপে একটি মিথ্যা কথা ও গাল-গল্প। যখন মানুষ সত্যিকারভাবে খোদাতা'লাকে ভালবাসে তখন খোদাও তাহাকে ভালবাসেন। তখন পৃথিবীতে তাহার গ্রহণযোগ্যতা বিস্তৃত করা হয় এবং হাজার হাজার মানুষের হৃদয় তাহার জন্য খাঁটি ভালবাসা সৃষ্টি করা হয়। তাহাকে আকর্ষণ করার শক্তি দান করা হয়। তাহাকে একটি জ্যোতিঃ দান করা হয় যাহা সদা সর্বদা তাহার সঙ্গে থাকে। যখন একজন মানুষ খাঁটি অন্তঃকরণে খোদাকে ভালবাসে এবং সমগ্র পৃথিবীর উপর তাঁহাকে প্রাধান্য দেয় ও গায়র উল্লাহ্‌র (আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য সব কিছুর) মহিমা ও প্রতাপ তাহার হৃদয়ে অবশিষ্ট থাকে না, বরং সে সকলকে মৃত কীটের চাইতেও অধম মনে করে, তখন খোদা যিনি তাহার হৃদয় দেখেন তিনি এক ভারী জ্যোতিঃ বিকাশের সহিত তাহার উপর অবতীর্ণ হন। যখন একটি স্বচ্ছ আয়নাকে এমনভাবে সূর্যের বিপরীত দিকে রাখা হয় যে, সূর্যের প্রতিবিম্ব উহার উপর পরিপূর্ণরূপে পতিত হয়, তখন রূপকভাবে বলা যাইতে পারে যে, ঐ সূর্যই যাহা আকাশে আছে তাহা এই আয়নাতেও বিদ্যমান আছে। অনুরূপভাবেই খোদা এইরূপ ব্যক্তির হৃদয়ে অবতীর্ণ হন এবং তাহার হৃদয়কে নিজের আরশে (সিংহাসনে) পরিণত করেন। ইহাই ঐ উদ্দেশ্য যাহার জন্য মানুষকে সৃষ্টি করা হইয়াছে। পূর্বের ধর্ম গ্রন্থসমূহে যেখানে পরিপূর্ণ সত্যবাদীগণকে খোদার পুত্ররূপে বর্ণনা করা হইয়াছে উহারও এই অর্থ নহে যে, তাঁহারা প্রকৃতপক্ষেই খোদার পুত্র। কেননা ইহাতো কুফরী। তিনি পুত্র ও কন্যা হইতে পবিত্র। বরং ইহার অর্থ এই যে, ঐ সকল পরিপূর্ণ সত্যবাদীর স্বচ্ছ আয়নায় খোদা প্রতিবিম্বরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এক ব্যক্তির প্রতিবিম্ব, যাহা আয়নায় প্রতিফলিত হয়, তাহা রূপক অর্থে যেন তাহার পুত্র।॥

কেননা যেভাবে পুত্র পিতা হইতে জন্ম লাভ করে ঠিক তদ্রূপই প্রতিবিম্ব নিজের আসল সত্তা হইতে জন্ম লাভ করে। অতএব যখন এইরূপ হৃদয়, যাহা অত্যন্ত স্বচ্ছ হয় এবং যাহাতে কোন ময়লা অবশিষ্ট থাকে না, তখন ইহাতে আল্লাহ্‌তা'লার জ্যোতির প্রতিফলন হয়। এমতাবস্থায় ঐ প্রতিফলিত ছবি রূপক অর্থে আসল সত্তার জন্য পুত্ররূপে পরিণত হয়। এই প্রেক্ষাপটেই তওরাতে বলা হইয়াছে যে, ইয়াকুব আমার পুত্র, বরং জ্যেষ্ঠ পুত্র। এই অর্থেই ঈসা ইবনে মরিয়মকে বাইবেলে পুত্র বলা হইয়াছে। খোদার কেতাবসমূহে রূপক অর্থেই ইব্‌রাহীম, ইসহাক, ইসমাঈল, ইয়াকুব, ইউসুফ, মূসা, দাউদ, সোলায়মান প্রমুখ নবীকে খোদার পুত্র বলা হইয়াছে। এই সীমা পর্যন্তই খৃষ্টানদের সীমাবদ্ধ থাকা উচিত ছিল।

অনুরূপভাবেই ঈসা (আঃ)ও তাঁহাদের অন্যতম। এমতাবস্থায় তাঁহার সম্পর্কে কোন আপত্তি উঠিত না। কেননা যেভাবে রূপক অর্থে এই সকল নবীকে পূর্বের নবীগণের কেতাবে পুত্ররূপে সম্বোধন করা হইয়াছে, সেভাবে কোন কোন ভবিষ্যদ্বাণীতে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে খোদারূপে সম্বোধন করা হইয়াছে। সত্য কথা এই যে, ঐ সকল নবী খোদার পুত্র নহেন এবং আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম খোদা নহেন। বরং এই সকল রূপক ভালবাসার প্রতীক। এইরূপ শব্দ খোদাতা'লার বাক্যে অনেক আছে। যখন মানুষ খোদাতা'লার প্রেমে এইরূপে বিলিন হইয়া যায় যে, তাহার নিজের বলিতে কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, তখন এই বিলীনতার অবস্থায় এইরূপ শব্দাবলী বলা হইয়া থাকে। কেননা এই অবস্থায় মধ্যখানে তাঁহাদের অস্তিত্ব থাকে না, যেমন আল্লাহ্‌তা'লা বলেন,

قل يعبادى الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا ٥

(সূরা আল্‌ যুমার : আয়াত ৫৪)। অর্থাৎ এই সকল লোককে বল, হে আমার বান্দারা! খোদার দয়া হইতে নিরাশ হইও না। খোদা সকল পাপ ক্ষমা করিবেন। এখন দেখ এই জায়গায় يا عباد الله (অর্থাৎ হে আল্লাহ্‌র বান্দারা) স্থলে يا عبادى (হে আমার বান্দারা) বলা হইয়াছে। যদিও মানুষ খোদার বান্দা এবং আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের বান্দা নহে। কিন্তু ইহা রূপক অর্থে বলা হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

(হাকিকাতুল ওহী পুস্তকের ধারাবাহিক বঙ্গানুবাদ)

জুমুআর খুতবা

হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক

(৯ই এপ্রিল, ১৯৯৩ মসজিদে ফযল লণ্ডনে প্রদত্ত খুৎবার সার সংক্ষেপ)

অনুবাদঃ মাওলানা সালেহ আহমদ
সদর মুরব্বী

তাশাহ্হুদ, তাআওউয আর সূরা ফাতেহার পর হুযূর (আইঃ) সূরা সাদ এর ৭৬-৭৭ ও ৭৮ নম্বর আয়াতের তেলাওয়াত করেন ঃ

قال يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدى ط استكبرت ام كنت من العالين ٥ قال انا خير منه ٥ خلقتنى من نار و خلقته من طين ٥ قال فاخرج منها فانك رجيم ٥ (سورة ص - ٧٦-٧٧-٧٨)

(অর্থাৎ তিনি (আল্লাহ্) বললেন, 'হে ইবলীস! আমি যাহাকে আমার দুই হাত দ্বারা সৃষ্টি করেছি তার আনুগত্য স্বীকার করতে তোমাকে কিসে বিরত রেখেছে? তুমি কি অহংকার করেছ না, তুমি আমার আদেশ পালন হতে নিজেকে অনেক উর্ধ্বে মনে করেছ'? সে বলল, 'আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, তুমি আমাকে আগুন হতে সৃষ্টি করেছ এবং তাকে কাদা মাটি হতে সৃষ্টি করেছ'। তিনি (আল্লাহ্) বললেন, 'তুমি এখান হতে বের হয়ে যাও, কারণ নিশ্চয় তুমি বিতাড়িত'।)

হুযূর বলেন, আল্লাহ্তা'লার ফযলে জামা'ত খেলাফতের ব্যবস্থাপনার বরকতে দিন দিন প্রতিষ্ঠিত হয়ে চলেছে। উপগ্রহের মাধ্যমে যখন থেকে আমার খুৎবা প্রচারিত হতে শুরু হয়েছে তখন থেকে জামা'ত ও খেলাফতের সম্পর্ক আরো গভীরভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত ও নিবিড় হয়ে চলেছে এবং তা আরো জোড়দার হতে থাকবে। জামাতের ব্যবস্থাপনা সুপ্রতিষ্ঠিত হবার সাথে সাথে আশংকাও বেড়ে চলেছে, কেননা শত্রুরা আমাদের এ ব্যবস্থাপনাকে মূল থেকে উপড়ে ফেলে দিতে চাচ্ছে। তাই এ সব ব্যাপারে সর্বদা জামা'তকে সাবধান থাকতে হবে। তবে সুসংবাদ এই যে, পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, জামা'তের বিস্তার লাভের সাথে সাথে নেযামের আনুগত্যে জামা'ত দিনে দিনে উন্নতি লাভ করছে। তবে কঠোর পরিশ্রমের প্রয়োজন ছিল, আছে ও হবে। বিভিন্ন আরব দেশে জামা'ত দিন দিন সুপ্রতিষ্ঠিত হতে চলছে। বাস্তবে সেখানে এতদিন 'আসহাবে কাহাফ' (গুহাবাসী) এর যুগ ছিল। কিন্তু বর্তমানে এই অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে। আজ সেখানকার একটি দেশে লাজনা ইমাইল্লাহ্র বাৎসরিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। অনুরূপভাবে ইণ্ডোনেশিয়াতেও আজ

লাজনার ইজতেমা হচ্ছে। তারা অনুরোধ জানিয়েছেন যে, এ উপলক্ষ্যে যেন তাদেরকে সম্বোধন করে কিছু বক্তব্য রাখি।

হুযুর বলেন, নেযামে জামা'ত খোদার হাতের প্রতিনিধিত্ব করে থাকে। সেই হাত দ্বারাই খলীফা নিযুক্ত করা হয়। এই প্রতিনিধিত্ব একের পর এক চলতে থাকে ও থাকবে। এই ব্যবস্থাপনা জামা'ত থেকে কোন পৃথক বস্তু নয়। আমাদের সবার সম্পর্কই খোদার সাথে। হুযুর বলেন, কুরআন মজীদ সমস্ত মানব জাতি বিশেষ করে মুসলমানদিগকে সাবধান করে ও সম্বোধন করে বলে যে, তোমাদের বিশেষ করে ইসলামের বড় শত্রু হলো অহমিকা ও অহংকার। যদি তোমরা এথেকে বিরত থাকো তাহলে তোমাদের আর কোন ভয় নেই। অহংকার মুক্ত না হলে তোমরা খোদার বান্দা হতে পারবে না। পৃথিবীতে দু'টি দল আছে একটি হলো শয়তানের দল আরেকটি হলো আল্লাহ্‌র বান্দার দল। খোদার বান্দা হবার শর্ত হলো, তোমরা অহমিকামুক্ত হও। অহংকারীর সাথে খোদার কোন সম্পর্ক নেই।

হুযুর বলেন, আমি যে আয়াত তেলাওয়াত করেছি তাতে আল্লাহ্‌তা'লা তাঁর হাত দ্বারা সৃষ্টির কথা বলেছেন। বস্তুতঃ এখানে আল্লাহ্‌র খলীফার উল্লেখ রয়েছে। দুই হাতে সৃষ্টির অর্থ হলো মানুষের প্রাথমিক অবস্থা, যেন সে সম্মান প্রাপ্ত হয়ে খোদাতা'লার প্রতিনিধি নির্বাচিত হতে পারে। এই সৃষ্টির ফলশ্রুতিতে যেন খোদার প্রতিটি ব্যবস্থাপনার সাথে তার সম্পর্ক গভীর হয়ে যায়। দ্বিতীয় সৃষ্টি হলো খোদার আধ্যাত্মিক ব্যবস্থাপনার সাথে যার মাধ্যমে সম্পর্ক আরোও গভীরতর হয়ে উন্নতির শিখরে উন্নিত হওয়া বুঝায় যাকে পবিত্র কোরআনে দ্বিতীয় সৃষ্টি বলে অভিহিত করেছে।

খোদার সৃষ্টিতে আল্লাহ্‌র খলীফা দুই ধরনের হয়ে থাকে। প্রথমতঃ এই সৃষ্টিতে সকল মানব অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ আশরাফুল মাখলুকাতের অন্তর্ভুক্ত হবার সৌভাগ্য লাভ করা। দ্বিতীয়তঃ খোদার মনোনীত ধর্মের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে খোদার তরফ হতে পথ প্রদর্শক নিযুক্ত হওয়া। অর্থাৎ মাহদী হওয়া। এভাবে যখন কারও জন্ম হয় তখন মানব জাতির জন্য তাঁর আনুগত্য করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। এমন কি তাঁর আনুগত্য ব্যতিরেকে তখন খোদাকে পাওয়া সম্ভব নয়।

হুযুর বলেন,(পঠিত আয়াতে) এই আয়াতে আল্লাহ্‌তা'লা বলেন, হে ইবলীস! তোমাকে তাঁর আনুগত্য হতে কিসে বিরত রেখেছে যাকে আমি নিজের দু'হাত দ্বারা সৃষ্টি করেছি? তুমি কি অহঙ্কারের দরুন এরূপ করছো? ইবলীস বলল, আমি তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তুমি আমাকে আগুন হতে সৃষ্টি করেছো এবং তাঁকে কাদা মাটি হতে। আমার ধাতু তো তার চেয়ে

উত্তম ও শক্তিশালী। আগুন সকল শক্তির উপর প্রাধান্য রাখে। যেহেতু তুমি আমাকে উত্তম ধাতু হতে সৃষ্টি করেছো তাই তাকে প্রত্যাখান করার অধিকার আমার রয়েছে। তখন আল্লাহ্ বল্‌লেন, তুমি এখান হতে বের হয়ে যাও। কারণ নিশ্চয় তুমি বিতাড়িত। একটি জটিলতা রয়েছে আর তা হলো এই যে, এই বিষয় বস্তুতে আল্লাহ্‌তা'লা কোন্ স্থান হতে বের হয়ে যেতে বল্‌লেন। জান্নাত তো হতেই পারে না কারণ শয়তান সেখানে প্রবেশ করতে পারে না। বস্তুতঃ এখানে সেই অবস্থার উল্লেখ রয়েছে যার কথা শয়তান বলেছে। আগুনের মধ্যে দু'টি বৈশিষ্ট্য রয়েছে (১) ইহা মানব জাতির জন্যে অত্যাবশ্যকীয় (২) ধ্বংসলীলার অপশক্তি। অতএব আগুনকে যদি খোদার অনুগামী হয়ে ব্যবহার করা যায় তাহলে তা আমাদিগকে মহান শক্তি দান করে থাকে। কেননা জীবনের জন্যে পৃথিবীর জন্যে ইহা অনিবার্য। অপর দিকে এই শক্তিই পৃথিবীকে ধ্বংস করে দিতে পারে যেমন আণবিক শক্তি। যতদিন আগুনের এ শক্তিটি অনুগামী হয়ে চলবে তা কল্যাণজনক কিন্তু যখনই বিদ্রোহ করবে তখনই পৃথিবীকে ধ্বংস করে দিবে। আল্লাহ্‌তা'লা উপরোক্ত আয়াতে বলেছেন যে, তুমি এখান হতে বের হয়ে যাও অর্থাৎ হে ইবলীস! আগুনের প্রকৃতিতে যে সকল কল্যাণকর বৈশিষ্ট্যসমূহ ছিল আজ হতে আমি তা কেড়ে নিলাম কারণ তুমি তা কাজে লাগাতে অস্বীকার করছো। হ্যাঁ, বাকী যে ক্ষতিকর দিকগুলি রয়েছে তা তোমার মাঝে অবশিষ্ট থাকবে কারণ তুমি তারই প্রয়োগে আকাঙ্খি, তুমি আনুগত্যের বাইরে থাকতে চাও। ঠিক আছে আমরা তোমাকে আনুগত্যের বাইরেই থাকতে দিলাম। তুমি কিয়ামতকাল অবধি তোমার সাহায্যকারীদের নিয়ে চেষ্টা চালিয়ে যাও। আমার বান্দাদের উপর তোমার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হবে না। যে তোমার প্রভাবে প্রভাবান্বিত হবে তার জন্যে রয়েছে কঠোর শাস্তি।

হুযুর বলেন, জামাতের ব্যবস্থাপনাকে খোদাতা'লা সৃষ্টি করেছেন। যারা অহমিকা ও আত্মভরিতা করে, বলে অমুক ব্যক্তি তেলাওয়াত জানে না, সে কিভাবে জামাতের কর্মকর্তা নিযুক্ত হয়? আমি অনেক ভোট পেয়েছি তবুও আমাকে বাদ দিয়ে আমার চেয়ে কম যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিকে কর্মকর্তা নিযুক্ত করা হয়েছে। আমি তার কথা মত আনুগত্য করব না। এমন ব্যক্তিদের গুণাবলীকে কেড়ে নেওয়া হয়। এরূপ লোক যতদিন জীবিত থাকে তারা নেযামের ক্ষতি করতে প্রয়াস চালিয়ে যায়। রাবওয়াতেও এ পদ্ধতিতে ফিৎনার প্রয়াস চালানো হয়েছে। অর্থাৎ অহমিকা ও অহঙ্কার দ্বারা। অহমিকা ও অহঙ্কার এমন এক সাপ যা যখনই সুযোগ পাবে ফনা তুলবে ও ছোবল দিবে। প্রত্যেক মানুষের মাঝে এই সাপ আছে। যতদিন মাথা নত রাখবে তা ততদিন নীরব থাকবে কিন্তু সুযোগ পেলেই ছোবল মারবে। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন, প্রত্যেক মানবের শিরায় ও রক্তে শয়তান আছে। সাহাবারা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার মাঝেও কি? বললেন, হ্যাঁ তবে

সে মুসলমান হয়ে গেছে। এই শয়তানই মানুষকে শক্তিশালী করতে পারে যদি তা আত্ম-সমর্পণ করে। আর এমতাবস্থায় সে অন্যান্য মানুষের চেয়ে বেশী খেদমত করতে পারে। এজন্যে যে ব্যক্তি আনুগত্যকে পরিত্যাগ করে সে সর্বদার জন্যে শয়তানের দাসে পরিণত হয়ে যায়। শক্তি ব্যতিরেকে মানুষ জীবিত থাকতে পারে না। অপশক্তি ও শুভশক্তি যদি অনুগামী হয় তবে সে উত্তম কাজ করতে পারবে। কিন্তু যদি আনুগত্য পরিত্যাগ করে তাহলে "ফাখরুয মিনহা" অর্থাৎ এখান হতে বের হয়ে যাও। সুতরাং জামা'তের ব্যবস্থাপনাকে বুঝে নিজেদের শক্তির হেফাযত করুন। চিন্তা করুন শক্তি কে প্রদান করেছে? শয়তানের আগুনের বিপরীতে আদমকে "তীন" (কাদা-মাটি) হতে সৃষ্টি করা হয়েছে। "তীন" তো বিলীন হয়ে যায়। অতএব খোদা সেই ব্যক্তিকে পসন্দ করেন, যে বিনয়ী হয় ও বিলীন হয়।

হুযূর বলেন, আমি নিখিল বিশ্ব জামা'তকে বলতে চাই যে, আপনারা নিজের চাল চলন দেখুন এবং সিদ্ধান্ত নিন আপনি কোন্ দলে। যতক্ষণ মানুষ পরীক্ষায় নিপতিত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তার আদম বা শয়তান হওয়া নির্ধারণ করা যায় না। আল্লাহ্‌র জামা'ত তো আদমের জামা'ত। যারা মাটির তৈরী তাদের পরিচয় লাভ অত্যন্ত সহজ। অতএব জামা'তের জন্যে নিজেকে বিলীন করে দাও, এবং খোদার দলে পরিণত হও। অনেক সময় দেখা যায় মজলিসে আমেলার সদস্য থাকাকালীন মানুষ চুপচাপ থাকে, যখন তাকে সরিয়ে দেয়া হয় অথবা সে নির্বাচিত হয় না তখন তার সঙ্গীদের বিরুদ্ধে কথা বলতে শুরু করে দেয়। এরূপ অবস্থায় আসল মনোবৃত্তির প্রকাশ পায়। এ পরিস্থিতিতে ধীরে ধীরে দলাদলি সৃষ্টি হয়ে সেখানে ফাসাদের দ্বার উন্মোচন হয়।

হুযূর বলেন, আমরা যেন আমাদের জীবনে নিজেদের জানমাল ইজ্জত থেকে জামা'তের সুনাম ও ঐক্যকে প্রাধান্য দেই। নিজেদের অহমিকা ও অহংকারকে সর্ব প্রকার শক্তি নিচয়কে অনুগামী করে খোদার বান্দায় রূপান্তরিত হই তাহলে এ নেযাম স্থায়ী হবে ও কেয়ামতকাল অবধি চলতে থাকবে।

(সেটেলাইটের মাধ্যমে প্রচারিত হুযূর (আইঃ)-এর খুতবার আলোকে)

বসনিয়া ফাণ্ড

বসনিয়ার মুসলমান ভাইদের ওপর দুঃখ কষ্ট লাঘবের জন্যে বন্ধুগণ বসনিয়া ফাণ্ডে চাঁদা দিতে ওয়াদাবদ্ধ হয়েছেন। এ চাঁদা যাতে সঠিক সময় তাদের নিকট পৌঁছানো যায় সেজন্যে সত্বর চাঁদা আদায়ের তাগিদ এসেছে। বন্ধুগণ যত তাড়াতাড়ি তাদের ওয়াদা-গুলো আদায় করে দিবেন ততই তাদের চাঁদা প্রদান সৌভাগ্যমণ্ডিত হবে।

সত্বর বসনিয়া ফাণ্ডের চাঁদা আদায় করে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)-এর দোয়ার সৌভাগ্য অর্জন করুন।

নামাযে রুকূ সিজদা ইত্যাদির তাৎপর্য

কিছুদিন পূর্বে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত একটি মজলিসে এলম ও ইরফানে অনেক বন্ধু হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)-এর খেদমতে এই মর্মে প্রশ্ন করেছিলেন যে, নামাযে দাঁড়ান, রুকূ, সেজদা ইত্যাদি যে আরকানসমূহ রয়েছে এর তাৎপর্য ও উপকার কি? হুযুর আনোয়ার সংক্ষিপ্ত উত্তর দিতে গিয়ে বলেন যে, এ প্রসঙ্গে সৈয়্যদনা হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) অতি বিস্তারিতভাবে আলোকপাত করেছেন যা জামাতী পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ করা দরকার। হুযুর (আইঃ)-এর এ পবিত্র নির্দেশ পালনার্থে প্রথম পদক্ষেপে হিসেবে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর মলফুযাত (বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে বক্তব্য— অনুবাদক) থেকে কতিপয় উদ্ধৃতি পেশ করা যাচ্ছে। আল্লাহ্‌তা'লা আমাদেরকে এই উত্তম শিক্ষাবলী উপলব্ধি করার এবং এসবের ওপর আমল করার তৌফীক দান করুন। আমীন।

খাকসার

আতাউল মুজিব রাশেদ

মসজিদ ফযল, লণ্ডন

(১)

"নামায ওঠা বসার নাম নয়। নামাযের সারবস্তু ও আত্মা হ'ল দোয়া যা নিজের মধ্যে এক প্রকার স্বাদ ও আনন্দ বহন করে। প্রকৃতপক্ষে আরকানে নামায (অর্থাৎ দাঁড়ান, রুকূ, সেজদা ইত্যাদি) আদব দেখানোর পদ্ধতি। আরকানে নামায আধ্যাত্মিক ওঠা-বসা স্বরূপ। মানুষকে আল্লাহ্‌তা'লার দরবারে দণ্ডায়মান হতে হয়। আর দাঁড়ানও সেবকগণ কর্তৃক (প্রভুকে) সম্মান দেখানোর একটি পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত।

রুকূ ইহার দ্বিতীয় অংশ। ইহা ব্যক্ত করে যে, আদেশ পালনের প্রস্তুতি হিসেবে যেন মাথাকে ঝুঁকিয়ে দেয়া হয়েছে আর সেজদা হলো তা যা চূড়ান্ত সম্মান ও পরম বিনয় এবং অস্তিত্ব বিলুপ্তির পরিচায়ক। ইবাদতের আসল উদ্দেশ্যে এই আদব ও পদ্ধতি খোদাতা'লা স্মারক চিহ্ন-হিসেবে বিশিষ্ট করে দিয়েছেন। দেহকে আধ্যাত্মিক পদ্ধতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার খাতিরে এগুলোকে নির্ধারিত করা হয়েছে। প্রকারান্তরে অভ্যন্তরীণ পদ্ধতি প্রতিষ্ঠার খাতিরে এক বাহ্যিক পদ্ধতিও রেখে দেয়া হয়েছে। এখন যদি বাহ্যিক পদ্ধতিতে (যা অভ্যন্তরীণ ও আধ্যাত্মিক পদ্ধতির এক প্রতিবিম্ব) কেবল বানরের মত অনুকরণ করা হয় এবং উহাকে যদি এক বড় বোঝা মনে করে বাইরে ফেলে দেয়ার চেষ্টা করা হয় তাহলে তুমিই বলো, এর মধ্যে কি স্বাদ ও আনন্দ লাভ হতে পারে? আর যখন পর্যন্ত স্বাদ ও

আনন্দ না লাগে তৎক্ষণ পর্যন্ত এর তাৎপর্য পাওয়ার অধিকারী কি ভাবে হবে? যখন আত্মাও সম্পূর্ণ বিলীন ও বিনত হয়ে ঐশী দরগাহে পতিত হয় এবং যে কথা বলে তা যেন আত্মাও সঙ্গে সঙ্গে বলে। ঐ সময়ে এক সুখ ও জ্যোতিঃ এবং স্বস্তি লাভ হয়ে যায়"।

(মলফুযাত: প্রথম খণ্ড: ১৬৪-১৬৫ পৃষ্ঠা)।

(২)

"স্মরণ রেখো, নামাযে অবস্থা আর বক্তব্য উভয়ই একীভূত হওয়া জরুরী। কখনও কখনও সংবাদ চিত্রের আকারে দেখানো হয়ে থাকে। এমন চিত্র দেখানো হয় যে, যদ্বারা দর্শকের এ উপলব্ধি হয় যে, তার ইচ্ছা এরূপ। নামাযের মধ্যেও ঐশী আকাঙ্খার চিত্র এরূপ। নামাযের মধ্যে যেভাবে জিহ্বা দ্বারা কিছু পাঠ করা হয় সেভাবেই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঞ্চালনেও কিছু দেখিয়েও দেয়া হয়। যখন মানুষ দণ্ডায়মান হয় এবং (আল্লাহ্‌তা'লার) প্রশংসা ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করে সে অবস্থার নাম রাখা হয়েছে কেয়াম (দণ্ডায়মান হওয়া)। এখন সব মানুষই অবগত আছে যে, প্রশংসা ও গুণ কীর্তনের যথার্থ অবস্থা কেয়াম-ই। বাদশাহের সামনে যখন তাঁর গুণকীর্তন করতে যাওয়া হয় তখন তো তা দাঁড়িয়েই উপস্থাপন করতে হয়। তাই এক দিকে বাহ্যিকভাবে কেয়ামকে রাখা হয়েছে অন্যদিকে মৌখিকভাবে প্রশংসা ও গুণ কীর্তনও রাখা হয়েছে। উহার উদ্দেশ্য ইহাই যেন আধ্যাত্মিকভাবেও আল্লাহ্‌তা'লার সামনে দণ্ডায়মান হয়। প্রশংসা কোন এক কথার ওপর ভিত্তি করে করা হয়ে থাকে। যদি কোন ব্যক্তি সত্যবাদী হয়ে কারও প্রশংসা করে তাহলে সে একটি সিদ্ধান্তের প্রতি উপনীত হয়ে যায়। ঐ ব্যক্তি যে আল্‌হামদুলিল্লাহ্ (অর্থাৎ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র-অনুবাদক) বলে তাঁর জন্যে ইহা আবশ্যক হয় যে, সে যথার্থভাবে তখনই আলহামদুলিল্লাহ্ বলতে পারে যখন তার পরিপূর্ণ ভাবে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে ও প্রতীতি হয় যে, সকল প্রকারের প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্‌তা'লারই জন্যে। যখন স্বস্তির সাথে অন্তরে এই কথা সৃষ্টি হবে তখন ইহাই আধ্যাত্মিক কেয়াম। কেননা অন্তর এর ওপরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। আবার ইহা উপলব্ধি করে যে, সে দণ্ডায়মান রয়েছে। অবস্থা অনুযায়ী দণ্ডায়মান হয়ে গেছে যেন আধ্যাত্মিক কেয়ামের সৌভাগ্য লাভ হয়।

এইরূপে রুকূর মধ্যে সুবহানা রাব্বীয়াল আযীম (পবিত্র আমার প্রভু অতীব মহান—অনুবাদক) পাঠ করা হয়। নীতিগত কথা এই যে, যখন কারও মহত্ব মেনে নেয়া হয় তখন তার প্রতি বিনত হওয়া জরুরী। মহত্বের চাহিদা এই যে, তার উদ্দেশ্যে যেন রুকূ করা হয় অর্থাৎ বিনত হয়। অতএব মুখ দিয়ে বলা হলো—সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম এবং কার্যতঃ রুকূ করে বিনত হয়ে দেখানো হলো অর্থাৎ ইহা কথার সাথে কাজেও দেখানো হলো। এইরূপে তৃতীয় কথা —সুবহানা রাব্বিয়াল 'আলা (পবিত্র আমার প্রভু অতীব উচ্চ—অনুবাদক) 'আলা হলো 'উলার তফযীল (অর্থাৎ সর্বাধিক অর্থে বুঝানো)। ইহার প্রত্যাশা হলো সেজদা। এজন্যে এর সাথে

কার্যতঃ চিত্র হলো সেজদায় নিপতিত হওয়া। এ স্বীকৃতির যথার্থ অবস্থা হলো তাৎক্ষণিক ভাবে বিলীন হওয়া।

এই কথার সাথে ৩ টি শারীরিক অবস্থা সম্পৃক্ত। এক চিত্র এর আগে উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রত্যেক প্রকারের কেয়ামের কথা বলা হয়েছে। জিহ্বা শরীরের একটি অঙ্গ সেও বল্ল। আর সেও উহার অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। তৃতীয় জিনিষ অন্যটি। যদি সে অংশ না নেয় তাহলে নামায হয় না। উহা কি? উহা অন্তর বা মন। উহার জন্যে আবশ্যক যে, অন্তরেরও কেয়াম হোক। আর আল্লাহ্‌তা'লা তার প্রতি দৃষ্টি দিয়ে দেখেন যে, প্রকৃতই সে প্রশংসাও করছে এবং দণ্ডায়মানও হয়েছে এবং তার অন্তরও দণ্ডায়মান হয়ে প্রশংসা করছে। কেবল দেহই নয় মনও দণ্ডায়মান আছে। আর যখন সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম বলে তখন যেন লক্ষ্য করে যে, কেবল এতটুকুই নহে যে, মহত্বের স্বীকৃতি দিচ্ছে বরং সাথে সাথে বিনতও হচ্ছে এবং সাথে সাথে অন্তরও বিনত হয়ে গেছে। এইভাবে তৃতীয় দৃশ্য খোদার সামনে সেজদায় পতিত হওয়া। তাঁর উচ্চ মর্যাদা সম্মুখে রেখে এর সাথেই দেখবে যে, ঐশী দরগাহে আত্মাও পড়ে আছে। সোজা কথা যতক্ষণ পর্যন্ত এই অবস্থার সৃষ্টি না হয় তখন পর্যন্ত স্বস্তি আসে না। কেননা ইউকিমুনাস্ সালাতা—তারা নামায প্রতিষ্ঠা করে—এর অর্থ ইহাই।" (মলফুযাত ঃ ১ম খণ্ড, ৪৩৩-৪৩৫ পৃষ্ঠা)

(৩)

"নামাযের মধ্যে যতগুলো দৈহিক বিভিন্ন অবস্থাদি রয়েছে এ সবের সাথে অন্তরও যেন সেভাবে অনুকরণ করে। যদিও শারীরিকভাবে দণ্ডায়মান হও তাহলে মনকেও খোদার আনুগত্যের জন্যে দণ্ডায়মান করো। যদি বিনত হও তো অন্তরকে সেভাবে বিনত করো। যদি সেজদা করো তাহলে মনকেও সেভাবে সেজদা করা উচিত। মনের সেজদা হলো এই যে, যে কোন অবস্থায় খোদাকে যেন ছেড়ে দেয়া না হয়। যখন এরূপ অবস্থা হবে তখন পাপ দূরে সরে যেতে শুরু করবে।" (মলফুযাত ঃ ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৩৭৬ পৃষ্ঠা)

"খোদাতা'লা আত্মা ও দেহের সাথে একটি নিবিড় সম্পর্ক রেখে দিয়েছেন। আর দেহের প্রভাব সর্বদাই আত্মার ওপরে পড়ে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ যদি কোন ব্যক্তি ভান করে কাঁদতে চায় তাহলে অবশেষে তার কান্না এসেই যাবে। এবং এরূপভাবেই যে ভান করে হাসতে চায় অবশেষে তার হাসি পেয়েই যায়। এভাবে নামাযের মধ্যে দেহের ওপরে যে সব অবস্থার সৃষ্টি হয়। যেমন, দণ্ডায়মান হওয়া বা রুকূ করা। উহার সাথে মনের ওপরও প্রভাব সৃষ্টি হয়। দেহের মধ্যে যতটুকু শ্রদ্ধা-ভক্তির অবস্থা প্রদর্শন করে ততটুকু আত্মায়ও সৃষ্টি হয়। যদি খোদা নিজের তরফ থেকে সেজদা কবুল না করেন তথাপি সেজদার সাথে আত্মার একটি সম্পর্ক আছে। এজন্যে নামাযের মধ্যে শেষ পর্যায়ে সেজদাকে রাখা হয়েছে। যখন মানুষ শ্রদ্ধা-ভক্তির চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যায় তখন ঐ সময়ে সে সেজদাই করতে আকাঙ্খা করে। পশুদের মধ্যেও এ অবস্থার লক্ষণ দেখতে পাওয়া যায়।

কুকুরও যখন তার প্রভুকে আদর করে তখন এসে তার পায়ের ওপর নিজের মাথা রেখে দেয় এবং তার ভালবাসার সম্পর্কের প্রকাশ সেজদার আকারে করতে থাকে। এথেকে সুস্পষ্টভাবে জানা যায় যে, দেহের সাথে আত্মার একটা বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। এভাবেই মনের অবস্থাসমূহের প্রভাব শরীরের ওপর প্রতিফলিত হয়ে যায়। যখন মন বিনীত হয় তখন দেহের ওপরে তার প্রভাব ছেয়ে যায় এবং অশ্রু ও বিমর্ষ অবস্থা প্রকাশ পায়। যদি দেহ ও মনের মধ্যে সম্পর্ক না হয় তাহলে এরূপ কেন হয়? রক্তকে প্রবহমান রাখাও হৃদপিণ্ডের একটি কাজ। কিন্তু এতে কোন সন্দেহ নেই যে, হৃদপিণ্ড শরীরে পানি সিঞ্চনের জন্যে একটি ইঞ্জিন স্বরূপ। এর সম্প্রসারণ ও সংকোচনে সব কিছু হয়ে থাকে।

মোদ্দা কথা, দেহ ও মনের কার্য উভয়েরই সমানে সমানে চলছে। মনের মধ্যে যখন বিপরীত অবস্থার সৃষ্টি হয়ে যায় তখন দেহের মধ্যেও তা সৃষ্টি হয়। এজন্যে যখন মনে প্রকৃতই বিনয় ও শ্রদ্ধা-ভক্তির অবস্থা সৃষ্টি হয় তখন শরীরে এর প্রভাব স্বতঃই সৃষ্টি হয়ে যায়। আর এভাবেই শরীরের ওপরে একটি পৃথক প্রভাব পড়ে আর মন এতে প্রভাবান্বিত হয়ে যায়। এজন্যে জরুরী যে, যখন নামাযের জন্যে খোদার সকাশে দণ্ডায়মান হও তখন অবশ্যই নিজের অস্তিত্বের মধ্যে বিনয় ও শ্রদ্ধা ভক্তি প্রকাশ করো। যদিও এ সময়ে ইহা এক প্রকার কপটতাস্বরূপ। কিন্তু আস্তে আস্তে এর প্রভাব স্থায়ী হয়ে যায় আর প্রকৃতই মনের মধ্যে ঐ শ্রদ্ধা-ভক্তি ও আত্ম বিলীনতার গুণ সৃষ্টি হতে থাকে।"

(মলফুযাত : চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪২১-৪২২)

(৪)

"আর এই বিষয় সম্বন্ধে আমি প্রথমে বর্ণনা করেছি—কেয়াম রুকূ ও সেজদা প্রসঙ্গে —এর মধ্যে মানবিক অনুনয় বিনয়ের আকৃতি ও নক্‌শা দেখানো হয়েছে। প্রথমে কেয়াম করা হয়। যখন এতে উন্নতি লাভ হয় তখন রুকূ করা হয় আর যখন পুরোপুরি বিলীনতার ভাব সৃষ্টি হয় তখন সেজদায় পতিত হয়ে যায়। আমি যা কিছু বলি তা অন্ধ অনুকরণ বা আচার আচরণ হিসেবে বলি না বরং নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলি। বরং প্রত্যেকেই ইহাকে এভাবে পড়ে এবং পরীক্ষা করে দেখতে পারে। এই ব্যবস্থাকে সর্বদা স্মরণ রাখো আর এথেকে উপকৃত হও যে, যখন কোন দুঃখ বা দুর্দশায় পতিত হও তখন তখনই নামাযে দণ্ডায়মান হয়ে যাও এবং যে দুর্দশা ও কষ্টে পতিত হয়েছ তা সবিস্তারে আল্লাহ্‌র সমীপে নিবেদন করো। কেননা অবশ্যই খোদা আছেন আর তিনিই একমাত্র অস্তিত্ব যিনি মানবকে প্রত্যেক প্রকারের কষ্ট ও দুর্দশা থেকে বের করতে পারেন। তিনি নিবেদনকারীর নিবেদন শুনেন। তিনি ব্যতিরেকে আর কেউ সাহায্যকারী হতে পারে না। ঐ লোক বড়ই দুর্বল, যখন সে দুর্দশায় পতিত হয় তখন সে উকিল, চিকিৎসক অথবা অন্যান্য লোকদের প্রতি মনযোগ দেয়। কিন্তু খোদাতা'লার নিকট মোটেও যায় না। মোমেন সে, যে সর্বপ্রথম খোদাতা'লার নিকট দ্রুত গমন করে।"

(মলফুযাত : ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১১৩)

(সাপ্তাহিক বদরের ১লা এপ্রিল '৯৩ সংখ্যার সৌজন্যে)

অনুবাদ : **মোহাম্মদ মুতিউর রহমান**

খোলা চিঠি

আহমদ সেলবর্ষী

মৌলবী শামছুদ্দীন কাসেমী, সভাপতি খতমে নবুওয়ত আন্দোলন ও মুহতামিম জামেয়া হোসাইনিয়া আরজাবাদ মীরপুর, ঢাকা বরাবরে—

আপনার রচিত 'কাদিয়ানী ধর্মমত' বইটি পড়লাম। বইটি পড়ে আমার মনে যে প্রশ্নগুলি জন্ম নিয়েছে তা ক্রমিক নম্বর দিয়ে পৃষ্ঠা উল্লেখ করে আপনার বরাবরে উত্তর প্রাপ্তির আশা নিয়ে প্রেরণ করলাম। আশা করি যথার্থ উত্তর দিবেন ঃ

(১) আপনি ৪৯ পৃষ্ঠা থেকে ৬২ পৃষ্ঠায় যা বর্ণনা করেছেন তাতে আছে পাদ্রীদের রিপোর্টে বলা হয়েছিল—'মুসলমানদের মধ্য হতে আমাদের আস্থাভাজন একজন পণ্ডিত ব্যক্তিকে নবীরূপে দাঁড় করাতে হবে।' 'এ নবীর ভক্তদের প্রচার কার্য শুধু মুসলমানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।' আপনি এই তথ্য—'দি ইণ্ডিয়ান মুসলমানস' এবং 'দি এ্যরাইভেল অব দি বৃটিশ ইম্পায়ার ইন ইণ্ডিয়া' থেকে দিয়েছেন বলে উল্লেখ করেছেন। এই দু'টি গ্রন্থের মূল কপিতে এই তথ্য প্রদর্শন করুন। মূল উদ্ধৃতি ও পৃষ্ঠা উল্লেখ করুন। আপনার কল্পনাকে বাস্তবে পরিণত করুন!

(২) লিখেছেন, মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী তার রচিত গ্রন্থসমূহে বার বার স্বীকার করেছে যে, বৃটিশ সরকারের অনুগ্রহে সে নবুওয়ত লাভ করেছে।' পুস্তকের নাম পৃষ্ঠা সহ মূল এবারত পেশ করুন। প্রমাণ করুন যে আপনার বক্তব্য মিথ্যা নয়, সত্য।

(৩) ঈসাকে (আঃ) আল্লাহ্‌তা'লা সশরীরে ঊর্ধ্বাকাশে উঠিয়ে নিয়ে গেছেন (৭২ পৃঃ) তা কুরআন হাদীস দ্বারা প্রমাণ করুন। কুরআনে অথবা হাদীসে 'ঊর্ধ্বাকাশ' শব্দটি দেখান।

(৪) আপনি লিখেছেন, মির্যা কাদিয়ানী আল্লাহ্‌র সবচেয়ে প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) হতেও শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করেছে (৭৭ পৃঃ)। প্রমাণ পেশ করুন। মিথ্যা বলা মহা পাপ। আপনি কি তা অবিশ্বাস করেন?

(৫) লিখেছেন, মির্যা কাদিয়ানীকে যেসব মুসলমান 'মানে না তার ভাষায় তাদের পিতা শূকর' (৯৩ পৃঃ) এর প্রমাণ পেশ করুন।

(৬) মির্যা সাহেব দাবী করেছেন, "আমি শরীয়তের অধিকারী পূর্ণ নবী' (১০১ পৃঃ)। আসল উদ্ধৃতি হুবহু পেশ করুন।

শুনেছি আপনি হানাফী সম্প্রদায়ের একজন মস্ত বড় আলেম। তাই আশা করব আপনার কল্পনায় রচিত এই সব বিষয়ে যে সত্য তা দলিল প্রমাণ দ্বারা পেশ করবেন।

(৭) লিখেছেন, 'ওহী নবী ছাড়া আর কারো উপর অবতীর্ণ হতে পারে না (১১৮ পৃঃ)

ম্‌সা (আঃ) ও ঈসা (আঃ)-এর মাতার উপর ওহী নাযিল হয়েছিল। এই দুইজন কি নবী ছিলেন?

(৮) সুনামগঞ্জ জিলার কাদিয়ানী প্রচারক বহু যুবককে কাদিয়ানী ধর্মমতে দীক্ষিত করে বৃটেনে পাঠিয়েছে (১২৯ পৃঃ)। ঐ সব বহু যুবকের মধ্যে মাত্র একজনের নাম-ঠিকানা পেশ করুন।

(৯) সৌদী বাদশাহ ফয়সলের চাপে ভুট্টো কাদিয়ানীদেরকে অমুসলমান ঘোষণা করে (১৩০ পৃঃ)। এই অপকর্মের জন্য আল্লাহ্‌র গজবে নিপতিত হয়ে ফয়সল ও ভুট্টো অস্বাভাবিকভাবে নিহত হয়। এর উত্তর কি?

(১০) এম, এম, আহমদ আয়ুব খাঁকে দিয়ে পঞ্চগড়ে কাদিয়ানীদেরকে দু'শ একর জমি বরাদ্দ করিয়ে ছিল (১৩১ পৃষ্ঠা)। এ ব্যাপারে দলিল পেশ করুন। সরকারী রেকর্ড থেকে প্রমাণ পেশ করুন। সরকারী রেকর্ড থেকে প্রমাণ পেশ করে আপনি যে একজন সত্যবাদী মৌলবী তা জানিয়ে দিন। মিথ্যা দিয়ে কি 'খতমে নবুওত' হেফাযত করা যায়?

(১১) কাদিয়ানীরা অধিকাংশ মুসলমান দেশ হতে বিতাড়িত হয়ে এখন বাংলাদেশে তাদের আস্তানা গেড়েছে (১৯০)। ঐ সব বিতাড়িত বিদেশী কাদিয়ানীরা বাংলাদেশের কোথায় বাস করে তা জানাবেন কি? একটি ঠিকানা বলুন।

জনাব মৌলবী সাহেব। আপনার বই থেকে মাত্র এগারটি মিথ্যা ভাষণ উদ্ধৃত করে আপনার উত্তরের প্রত্যাশায় প্রত্র লিখলাম। যদি ঠিক উত্তর না দিতে পারেন (কখনও পারবেন না) তাহলে মনে করব আপনি অনর্গল মিথ্যার বেসাতি করে আপনার পাঠকদেরকে বোকা বানাতে চেয়েছেন।

সচ্‌ সচ্‌ কহো আগর না বনা তুম সে কুচ জবাব
ফের ভি ইয়ে মোহ্‌ জাহাঁকো দেখও গে ইয়া নেহি?

(২২ পাতার পর)

এতো কিছু সত্ত্বেও সবশেষে উল্লেখ করবো, রাজাকারতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বিপরীতে গণতন্ত্র ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা পুনরুজ্জীবনে একটি ক্ষীণ আলোও দেখা যাচ্ছে। প্রধানত নির্মূল কমিটি ও সমন্বয় কমিটির কর্মকাণ্ডের দরুন রাজাকারতন্ত্রের বিরুদ্ধে মানুষ ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে। সাম্প্রতিক পৌরসভা নির্বাচনে জামাত একটি আসনও পায়নি। স্বয়ং আইন প্রতিমন্ত্রী ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে রাজশাহীতে নেতৃত্ব দিয়েছেন সর্বদলীয় মিছিলের। এ ঘটনার পর সংসদে মতিউর রহমান নিজামী বক্তৃতা দিতে উঠলে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির সংসদরা একত্রে 'রাজাকার' 'রাজাকার' ধ্বনি দিয়ে তাকে বসিয়ে দিয়েছেন।

আমরা যারা নিজেদের মানুষ মনে করি, তাদের বেছে নিতে হবে বিএনপি-জামাতের রাজাকারতন্ত্র আমরা চাই, না গণতন্ত্র চাই। রাজাকারতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হলেও দেশে শান্তি আসবে, সে প্রতিশ্রুতিও দিচ্ছে রাজাকাররা। কিন্তু তা হবে কবরের শান্তি। আর মানুষ যদি মানবেতর হতে না চায়, তা'হলে গণতন্ত্রের উষ্ণতার জন্য সব ভুলে রাজশাহীর সেই সর্বদলীয় মিছিলের মতো রাজাকারতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সামিল হতে হবে। আর ক্রীতদাস হতে চাইলে মেনে নিতে হবে রাজাকারতন্ত্র, মেনে নিতে হবে এদেশে রাজাকার বড়, মানুষ নয়। এখন যার যা ইচ্ছে।

মুনতাসীর মামুন: প্রাবন্ধিক ও কলাম লেখক। অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। (১১ই ফাল্গুন, ১৩৯৯-এর দৈনিক ভোরের কাগজের সৌজন্যে)।

যে দেশে রাজাকার বড়

মুনতাসীর মামুন

"এ দেশে, যে দেশের নাম বাংলাদেশ, সে দেশে এখন রাজাকার বড়, মানুষ নয়। রাজাকার আর মানুষে তফাৎ আছে। মানুষ এদেশে হাজার বছর ধরে ছিল, হয়ত থাকবে আরো হাজার বছর। 'হয়ত' শব্দটি ব্যবহারে অনেকে অবাক হতে পারেন, কিন্তু শব্দটি ব্যবহারে যুক্তি আছে। কারণ, এ দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির মতো রাজাকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, আরো পাবে। হয়ত, এক সময় সারা দেশের মানুষকে হতে হবে রাজাকার, ইচ্ছা বা অনিচ্ছায়।

কিন্তু একটা সময় ছিল যখন এ দেশে রাজাকার ছিল না। রাজাকার বিষয়টি দূরে থাকুক, শব্দটিই ছিল অপরিচিত। নতুন ফসলের মতো, এই শব্দটির বীজ বোনা হয়েছিলো ১৯৭১ সালের সেই সব ভয়াবহ দিনগুলিতে। 'রাজাকার' শব্দটির অর্থ সেচ্ছাসেবী। কিন্তু সুন্দর একটি শব্দের অর্থ কিভাবে বদলে ভয়ংকর হয়ে যায় তার উদাহরণ এই শব্দটি। না, ভুল বললাম, বাংলাদেশে বদলে গেছে আরেকটি শব্দের অর্থ। সেটি হচ্ছে—ইনকিলাব। আসলে এর অর্থ বিপ্লব। আলবদর গোত্রীয় কেউ যখন তা ব্যবহার করে তখন এর অর্থ যে কি ধারণ করে তা সচেতন কারো অজানা নয়।

১৯৭১ সালে, মুক্তিযুদ্ধের মরণপণ দিনগুলিতে রাজাকার কিসের স্বেচ্ছাসেবী ছিল? সে ছিল হানাদার বাহিনীকে বাঙালী রমণী ধর্ষণে সহায়তা করার স্বেচ্ছাসেবী। সে ছিল আলবদর ও পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর বাঙালী নিধনে সহায়তাকারী। সে ছিল এইসব লুটেরাদের লুট করতে সাহায্য করার স্বেচ্ছাসেবী।

তবে, পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী থেকে এদের অবস্থান ছিল অধস্তন। মূলত, এদের কাজ ছিল, মুক্তিযুদ্ধাদের ধরিয়ে দেয়া ও হানাদার পাকিস্তানী 'মোছুয়া'দের ক্রীতদাস হিসাবে সর্বতোভাবে সাহায্য করা। 'রাজাকার'দের পাশাপাশি ছিল সে সময় 'আল-শামস' 'আল-বদর'—যাদের সরাসরি উল্লেখ করা যায়, 'ডেথস্কোয়াড' হিসেবে। রাজাকার যদি এ দেশে বড় না হয়, তা হলে দেশের সর্বোচ্চ পদে বা ১৯৭১ সালের খুনী বাহিনীর নেতা কি ভাবে নির্বাচিত হন? তখন, অবশ্য রাজাকার ও আল-বদর, আল-শামস, হানাদার বাহিনীর ক্রীত-দাস হলেও রাজাকারদের থেকে তাদের ক্ষমতা ছিল বেশী। এরা যাকে খুশী তাকে নিয়ে হত্যা করতে পারতো। সে অর্থে তখন রাজাকারের ক্ষমতা ছিল সীমিত।

স্বাধীনতার পর রাজাকার শব্দটির অর্থ বদলাতে থাকে। 'আল-শামস', 'আল-বদর' থেকে 'রাজাকার' শব্দটি উচ্চারণ করা যায় সহজে। তা'ছাড়া, যুদ্ধের সময় 'আল-বদর' 'আল-শামস' থেকে রাজাকারের সংখ্যা ছিল বেশী এবং তৃণমুল পর্যায় পর্যন্ত রাজাকার সৃষ্টি

করায় শব্দটি পরিচিত ছিল বেশী। ফলে, আস্তে আস্তে শব্দটি অর্থের ব্যাপকতা বৃদ্ধি পায়। প্রাক স্বাধীনতা পূর্বে 'রাজাকার' শব্দটি ব্যবহৃত হতো সংকীর্ণ অর্থে। এখন, শব্দটি ব্যবহৃত হচ্ছে ব্যাপক অর্থে।

স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় রাজাকারকে কেউ মানুষ মনে করতো না। জানোয়ার ও মানুষে তফাৎ আছে। সে তফাৎ শিল্পী কামরুল হাসান দেখিয়েছিলেন ১৯৭১ সালে একটি পোষ্টারে। ঐ পোষ্টারটিতে হানাদার পাক-সেনাদের তুলে ধরা হয়েছিলো জানোয়ার হিসেবে, যাদের মুখের আদল ছিল ইয়াহিয়া-দানবের মতো। পোষ্টারটিতে মানুষকে আহ্বান জানিয়ে বলা হয়েছিলো—তারা মানুষ হত্যা করেছে, আসুন আমরা পশু হত্যা করি। ফলে, খানসেনাদের সহযোগী রাজাকারদের আরেকটি অর্থ মানুষের মনে গেঁথে গিয়েছিলো, তা হলো—হত্যাকারী। তাই দেখি, স্বাধীনতার কুড়ি বছরের মধ্যে, হত্যাকারী, দালাল, আল-বদর, দেশদ্রোহী, জামাতী, ভিন্ন ভিন্ন অর্থ বহনকারী শব্দগুলি একীভূত হয়ে গেলো রাজা-কারে। এখন তাই, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিকৃতকারী, মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী বা ঐ বিরোধীর সঙ্গে আঁতাতকারীকে অনায়াসে আখ্যা দেওয়া হয় রাজাকার হিসেবে। এখন রাজাকার বললে বোঝায় মূলত মুক্তিযুদ্ধের চেতনা হননকারীকে।

স্বাধীনতা যুদ্ধের পর স্বাভাবিকভাবেই গুরুত্ব পাওয়ার কথা ছিল 'মুক্তিযোদ্ধা' শব্দটির। কিন্তু পৃথিবীর একমাত্র সব সম্ভবের দেশ বাংলাদেশ দেখা গেল গুরুত্ব হারিয়েছে 'মুক্তিযোদ্ধা' শব্দটি। বরং পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছে 'রাজাকার' শব্দটি। স্বাধীনতার পর এ শব্দটি ফের গুরুত্ব পেয়েছিলো জেনারেল জিয়াউর রহমানের সময়। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি ছিলেন এক-জন সেক্টর কমাণ্ডার, স্বাধীনতার পাঁচ বছরের মধ্যে তিনি হয়ে উঠেন বাংলাদেশের ভাগ্য নিয়ন্তা। ক্ষমতা করায়ত্ব করে তিনি গুরুত্ব সহকারে দু'টি প্রকল্প গ্রহণ করেছিলেন। একটি হলো খালকাটা, অপরটি রাজাকার পুনর্বাসন। প্রতীকী অর্থে অনেকে মনে করতেন, বস্তুত দু'টি প্রকল্পের মধ্যে ফারাক খুব কমই কারণ, খাল কেটেই কুমীর আনা হয়।

জেনারেল জিয়াউর রহমান যত্রতত্র খাল কাটার সঙ্গে সঙ্গে রাজাকারদেরও ধরে আনতে লাগলেন। অনেকে খালে বেনোজলের মতো ভেসেও এলো। মুক্তিযুদ্ধের পাঁচ বছর পেরুতে না পেরুতে দেখা গলো, রাজাকার শাহ আজিজুর রহমান প্রধান মন্ত্রী। মন্ত্রীত্ব লাভ করলেন আবদুল আলীম ও আবদুল মন্নান। শেখ মুজিবের হত্যা মানুষকে বিমূঢ় করে দিয়েছিলো। এসব ঘটনাবলী মানুষকে স্তব্ধ করে দিলো। রাজাকার শব্দটি পুনঃপ্রবর্তন, সমাজে রাজাকারকে গ্রহণযোগ্য করে তোলার প্রচেষ্টা এবং পরিণামে সমাজকে সংঘাতময় করে তোলার ক্ষেত্রে জেনারেল জিয়াউর রহমানের অবদান ভোলার মত নয়। ইতিহাসের ছাত্র হিসেবে আমার মনে হয়, বাংলাদেশের ইতিহাসে জেনারেল জিয়াকে বেতারে স্বাধীনতা ঘোষণার পাঠকের চেয়ে শেষোক্ত ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখার জন্য উল্লেখ করা হবে। জেনারেল

জিয়া এক্ষেত্রে আরেকটি বিষয় প্রমাণ করেছিলেন, বাংলাদেশের ইতিহাসের জন্য যা গুরুত্ববহ তা হলো—মুক্তিযোদ্ধা হওয়া সহজ মুক্তিযোদ্ধা থাকাটাই কঠিন।

জেনারেল জিয়া সব সময় কালো চশমা পরে থাকতেন। এবং বলতেন, রাজনীতিকে 'ডিফিকাল্ট' করে তুলবেন। তাঁর এ প্রতিজ্ঞা তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। রাজনৈতিক দলগুলি খণ্ড বিখণ্ড হয়ে গিয়েছিলো। তার ওপর সমন্বয়ের রাজনীতির নামে চরম বামপন্থী ও খুনে চরম গণপন্থীর মিলন, অর্থের দেবার ব্যবহার বাংলাদেশের রাজনীতির ধারাই পাল্টে দিয়েছিলো। জেনারেল জিয়ার এ অবদানও ভোলার মতো নয়।

শেখ মুজিব জামাতকে নিষিদ্ধ করেছিলেন। জেনারেল জিয়া সে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করেছিলেন। এভাবে তিনি রাজাকারদের ভিত্তি ঠিক করে দেবার পর, জামাত ও চরম বাম-পন্থীদের মিলিত যৌথ প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো রাজাকারীকে একটি তাত্ত্বিক ফ্রেমে দাঁড় করানো। এই নতুন তত্ত্ব হলো রাজাকারবাদ। এই ফ্রেমের ভিত্তি জামাতী দর্শন ও ধ্যান ধারণা। তাদের উদ্দেশ্য বা প্রধান লক্ষ্য ধর্ম ও ধর্ম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। এটি বেছে নেয়ার কারণ, অশিক্ষিত সমাজে ধর্মের ভুল ব্যাখ্যা দেয়া সহজ, সহজে ধর্মের নামে প্রতারণা করা যে কোন কারণে দেখি এবং খাঁটি আলেমরা বলেছেন, জামাতের ইসলাম ও প্রকৃত ইসলামে পার্থক্য আছে। জামাতের ইসলামকে 'রগকাটা ইসলাম' বলা হয়। অর্থাৎ জামাতী বা রাজাকারী ধ্যান-ধারণার বিপরীত হলে রগ কেটে হত্যা করতে হবে। জামাতে ইসলামের অর্থ মানুষ বা প্রকৃত ইসলামকে দমন করতে হলে কোরান শরীফ পোড়াতে হবে। ১৯৭১ সালে তারা কোরান পুড়িয়েছিলো, কয়েকদিন আগেও আহমদিয়াদের কোরান সংগ্রহ পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। জামাতের অর্থ, রাষ্ট্রকে সাম্প্রদায়িক করে তুলতে হবে, সংখ্যালঘুকে জিম্মি রেখে ফায়দা লুটতে হবে, নারীদের ক্রীতদাসীর মতো ব্যবহার করতে হবে। জামাতে ইসলামের অর্থ সৌদি আরবের আনুকুল্য পেতে হবে, পাকিস্তান না চাইলেও তার সঙ্গে মিলিত হতে হবে, সেটি সম্ভব না হলে পাকিস্তানী ভাবধারা ছড়িয়ে দিতে হবে, 'নায়েব' 'আমীর' এসব নামে মধ্যপ্রাচ্যের মধ্যযুগীয় শেখদের মতো 'রুলিং এলিট' তৈরি করতে হবে। একটি বিষয় লক্ষ্য করুন, নেতাদের পদের নামকরণ এভাবে করা হয়েছে যাতে মানুষ ভয় পায়। কারণ, বাঙালীর ওপর এসব নামধারী লোকেরা যুগ যুগ ধরে অত্যাচার করে আসছে। এক কথায় মানুষকে পাথর চাপা দিয়ে রাখতে হবে।

গণতন্ত্রের বিপরীতে রাজাকারতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হলে, দ্বিতীয় পর্যায়ে হলো রাজা-কারবাদকে সমাজ ও রাষ্ট্রের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে দেওয়া। এ জন্য রাজাকাররা নানা কৌশল গ্রহণ করেছিলো এবং আজও তাদের এ কৌশল কার্যকর করার পেছনে সবচেয়ে বেশী অবদান রেখেছে সামরিক শাসকরা। গত দেড় দশকে সামরিক শাসকরা পুত্রবৎ স্নেহে রাজাকারদের লালন করেছে। উভয়ের মধ্যে অলিখিত একটি সমঝোতা আছে, কারণ উভয়েই প্রগতির বিরোধী। মানুষ প্রগতির দিকে এগুলো তো আর রাজাকারবাদ বা সামরিকবাদ থাকে না।

যে কারণে দেখুন চট্টগ্রামে নৌবাহিনী যে নির্মম তাণ্ডবলীলা সংঘটিত করেছে সে বিষয়ে সবাই প্রতিবাদ করলেও জামাত প্রায় নিশ্চুপ। সামরিক শাসকদের এ হেন পুত্রবৎ স্নেহের কারণ, মানুষের স্পিরিটকে দমন করা, রাজাকাররাও তাই চায়; সুতরাং সামরিক শাসকদের ফ্রন্ট হিসাবে কাজ করতে আপত্তি কি?

এতোসব কিছুর পরও, নব্বইয়ের গণআন্দোলনের পর সবাই ভেবেছিলেন, ফের নতুন করে শুরু করা যাক। মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম আকাংক্ষা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হোক। বিএনপি'র উৎস এবং রাজাকার প্রতিষ্ঠায় তার অবদান সত্ত্বেও অনেকে আশাবাদী ছিলেন যে অবস্থার পরিবর্তন হবে।

এখানেই আমরা ভুল করেছিলাম। আমরা ভুলে গিয়েছিলাম যে, আজীবন ক্যান্টনমেন্টে থেকে বেগম খালেদা জিয়ার পক্ষেও সামরিকতন্ত্র ও রাজাকারতন্ত্রের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি বর্জন করা অসম্ভব। সে কারণে, জামাতের প্রায় দাবীর কাছে তিনি মাথা নত করেন। পত্রিকায় দেখেছি, কয়েকদিন আগে, আহমদীয়ারা মুসলমান কিনা তা পরীক্ষার জন্য বায়তুল মোকারমের খতীবের নেতৃত্বে একটি কমিটি করা হয়েছে। এ দাবীটি ছিল জামাতের এবং পত্র-পত্রিকায় দেখেছি এই ইমাম জামাতের সভায় বক্তৃতা দিতে পছন্দ করেন।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বিএনপি ক্ষমতায় আসার সঙ্গে সঙ্গে আবার রাজাকারবাদ প্রতিষ্ঠা করার প্রকল্প গ্রহণ করেছে। আজ রাজাকারতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য বেশ কিছুসংখ্যক বুদ্ধিজীবীও প্রকাশ্যে যুক্ত হয়েছেন প্রথমবারের মতো। এর মধ্যে আছে সাংবাদিক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের একটি অংশ। তারা বলেন তারা মুক্তিযুদ্ধে বিশ্বাসী, তারা আওয়ামী লীগ পছন্দ করেন না। সে কারণে তারা বিএনপি করেন। জামাত যদি বিএনপিকে সমর্থন করে তাদের কি করার আছে? অনেকটা স্ত্রী অপছন্দ করে দাসীকে পছন্দ করার মতো। জামাতীদের সাহায্য নেবো জামাতী আদর্শ প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করবো অথচ মুক্তিযোদ্ধা বলবো এ রকম তত্ত্ব বাংলাদেশেই সম্ভব! জামাত এখন একটি মুক্তিযোদ্ধা সংসদ গঠন করেছে এটিও তো এদেশেই সম্ভব। আসলে, এরা মূলত সুবিধাবাদীতন্ত্রে বিশ্বাসী, মীরপুরের বিগত চেয়ারম্যান আবদুল খালেকের মতো, সরকারকে এরা ভালোবাসেন। সুতরাং এখন বিএনপি ও জামাতকে ভালোবাসায় আর দোষ কি?

রাজাকাররা এভাবে সুবিধাবাদীদেরকে নিয়ে শক্তি সঞ্চয় করে এগুচ্ছে। মরণ কামড় দেবার জন্য তারা এখন প্রস্তুত। ১৯৭১ সালে তারা যেভাবে সহায়তা করেছিলো প্রয়োজনে তারা এখন তাও করবে, এবং আরো ব্যাপকভাবে। সে আলামতগুলি কি দেখা যাচ্ছে না? রাজশাহীতে জামাত-শিবির কি করেছে? ভালোবাসার প্রতিদান তারা এভাবেই দেবে। ছাত্রদলের সদস্যদের একটি কথা মনে করিয়ে দিতে চাই, তাদের ওপর যখন শিবির বাহিনী হায়েনার মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো, তখন তাদের সাহায্য করতে এগিয়ে এসে ছিলো তারা, যাদের তারা শত্রু মনে করে। যাদের তারা মিত্র মনে করে তারা নয়। না হলে, হত্যাকাণ্ড হয়ত আরো ব্যাপক হতো।

(অবশিষ্টাংশ ১৮ পাতায় দেখুন)

কেন আহমদী হলেম

(১৯শ সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর)

সংফরাজ এম, এ, সাত্তার রঙ্গু চৌধুরী

সে যা হউক। যদিও আমি খৃষ্টান মতে বিশ্বাসী, তথাপি তাদের একটি কথাকে আমি মনে প্রাণে গ্রহণ করে নিতে পারিনি। আমার অন্তরের অন্তঃস্থলে যেন সেই কথাটি হাতুড়ি পিটাতো। আর তা হলো যীশু ঈশ্বরের একমাত্র জাত পুত্র। খোদা একজন নহেন। খোদা এক খোদা, মরিয়ম এক খোদা, খোদার পুত্র যীশু (ঈসা আঃ) এক খোদা, তিনে এক, একে তিন, তিন জনে একজন, একজনে তিনজন অর্থাৎ খোদা একজন নহেন, তিন জন। এখান থেকেই শুরু হলো ধর্মের প্রতি আমার একটা অশ্রদ্ধার ভাব। কোন কোন রাত্রে আমার ঘুম হতো না। এক একবার ভাবি, খোদা বলে কি কেউ আছেন, যদি থাকবেনই তবে ধর্মের মধ্যে কোন মীমাংসা নাই কেন? আবার ভাবি খোদা বলে যদি কেউ নাই বা থাকেন, তা হলে আসমান জমিন চন্দ্র, সূর্য, জীবজন্তু, পাহাড়, পর্বত, বৃক্ষলতা ইত্যাদি সৃষ্টি করলোই বা কে? এখন আমি আস্তিকও নই নাস্তিকও নই। বহু চিন্তা-ভাবনার পর জানার এবং বুঝার আগ্রহ নিয়ে বড় বড় নামজাদা আলেম ওলামার স্মরণাপন্ন হতে লাগলাম। যেখানেই কোন নামজাদা আলেমের নাম শুনি, সেখানেই দৌড়াই হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে জানার জন্য। কলকাতার বড় মসজিদের ইমাম থেকে শুরু করে কিশোরগঞ্জের শহিদী মসজিদের মাওলানা আতাউর রহমান তক দৌড়া দৌড়ি করলাম। সকলেই এক বাক্যে বললেন যে, হযরত ঈসা (আঃ) চতুর্থ আসমানে সশরীরে জীবিত আছে। শেষ যুগে আবার তিনি চতুর্থ আসমান থেকে নেমে এসে তলোয়ারের যুদ্ধে দাজ্জালকে হত্যা করবেন, ক্রুশ ধ্বংস করবেন। এসব প্রশ্ন করাও সহজ ব্যাপার ছিল না। কলকাতার বড় মসজিদের ইমাম তো আমাকে মেরেই বসতেন যদি না আমার পরিধানে নৌবাহিনীর পোষাক থাকতো। আমার প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন যে, তোমাদের কর্তব্য হলো শুনলাম এবং মানলাম, অতসব প্রশ্ন কেন? এখন আমি বললাম যে, আমি তো শুনলাম, মানবো কাকে? জীবন্ত খোদার জীবন্ত যীশু (ঈসা আঃ) কে অথবা মৃত আব্দুল্লার, মৃত পুত্র মোহাম্মদকে? মনে মনে একটা অশ্রদ্ধার ভাব চলে এলো আলেমদের প্রতি আমার। স্থির করলাম আর তাদের স্মরণাপন্ন হবো না। আমি এই ধারণা পোষণ করতাম যে, যদি হযরত ঈসা (আঃ) চতুর্থ আকাশে সশরীরে জীবিত থেকে থাকেন, তবে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) কখনও সর্বশ্রেষ্ঠ বা শেষ নবী নহেন। হযরত ঈসা (আঃ)ই বড় নবী কেননা তিনি যখন জীবিত আছেন এমতাবস্থায় তাঁর তুল্য আর কেহই নহেন। আলেম ওলামার স্মরণাপন্ন হওয়া থেকে হাত ধুয়ে সর্বশক্তিমান খোদাতা'লার স্মরণাপন্ন হলাম।

নির্মল অন্তরীক্ষের পানে দৃষ্টি নিবদ্ধ হতেই বুকের ভেতর থেকে বের হয়ে আসলো হে দীন দুনিয়ার মালিক খোদা! হে সৃষ্টি কর্তা বলে তুমি কেউ আছ কি? হে সমগ্র জগতের পালন কর্তা! খোদা বলে তুমি কেউ আছ কি? যদি সর্বশক্তিমান খোদা বলে তুমি কেউ থেকে থাক তবে আমি আজ বিপাকে পড়ে ডাকছি, আমার ডাকে সাড়া দাও। আমি পথ পাচ্ছি না, তুমি পথ দেখিয়ে কোলে তুলে নাও, বিপদে পড়েছি উদ্ধার কর। আমি অন্ধকারে হাতরিয়ে মরছি, কূল কিনারা পাচ্ছি না। আমি অন্ধ বধির পথ পাচ্ছি না, বুঝতে পারছি না কোন্‌টি তোমার সত্য এবং সঠিক পথ। আমাকে পথ দেখাও। আর, আজ যদি আমার ডাকে সাড়া না দাও, আর আমি যদি ভুল পথে চলে যাই তবে তোমার সেই বিচারের দিন তুমি আমাকে দোষী সাব্যস্ত করো না। এই কথা কয়টির সাথে সাথে আমার নয়ন যুগল থেকে কয় ফোটা গরম জলও দুগণ্ড বেয়ে ঝরেছিল।

আল্লাহ্‌ যেন আমার ডাক শুনলেন। শুধু শুনলেনই না। আমার চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন। কোন্‌টি তাঁর সত্য এবং সঠিক পথ। ময়মনসিংহ বর্তমান কিশোরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত পাকুন্দিয়া থানায় আহুতিয়া গ্রামে আমার পৈত্রিক নিবাস। ১৯৪৫ সনে যুদ্ধ শেষে চাকুরী করবো কি করবো না, ইত্যাদি মনোবাসনা নিয়ে কয়েক দিনের জন্য বাড়ীতে এসেছিলাম। দিন দুই পরে ঢাকার পথে কলকাতা হয়ে বোম্বে যাব। যাবার পথে ঢাকায় আমার কোন এক আত্মীয়ের বাসায় দু একদিন বেড়িয়ে যাব মনস্থির করেছি। ইতোমধ্যে একদিন বেতাল নিবাসী আব্দুস সামাদ নামে আমার এক প্রাইভেট শিক্ষকের সাথে দেখা। কুশলাদি বিনিময়ের পর তিনি আমাকে বললেন, তুমি যখন ঢাকায় যাচ্ছ তখন মির্জালীর কাছে আমার একটি চিঠি নিয়ে যাও, তাকে আমার এই চিঠিটি দিবে। এই বলে ইংরেজীতে একটি চিঠি লিখে আমার হাতে দিলেন। শুনেছি মির্জালী সাহেবও নাকি তাঁর ছাত্র। নির্দিষ্ট দিনে যাত্রা করলাম মঠখোলা থেকে গয়নার নৌকা যোগে কাঁওরাইদ হয়ে ঢাকায়। গয়নার নৌকার ভিতরে নানান জায়গার নানান লোক তন্মধ্যে কয়েকজন আলেম, কয়েকজন শিক্ষক ও ছাত্র, বাকী সবাই গরুর ব্যাপারী। তারা যাচ্ছেন মীরপুর গরু কিনার জন্য। বিভিন্ন জায়গার বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন আলাপ আলোচনায় গয়নার নৌকাখানি সরগরম হয়ে উঠলো বেশ। প্রথমে আলাপ পরিচয় তারপর গল্প গুজবের মধ্য দিয়ে উঠলো কাদিয়ানীদের কথা। কেউ বললেন কাদিয়ানী একটি নতুন ধর্ম, তারা হযরত রসূল করীম (সা:)কে শেষ নবী বলে মানে না। কেউ বললেন কাদিয়ানী ধর্ম খৃষ্টানদের একটি শাখা, বিভিন্ন লোভ লালসার মাধ্যমে লোকদেরকে ভুলিয়ে ভ্রান্ত পথে চালিত করছে। কেউ কাদিয়ানীগণ দাজ্জালেরই চেলা, মানুষের ঈমান নষ্ট করে দিচ্ছে। বাপ দাদা চৌদ্দ পুরুষ যাবৎ আমরা যা মেনে আসছি, তারা বলছে কি উল্টো। মেয়েদের ব্যাপারে এমনি একটি জঘন্য কথা বললো, যার উল্লেখ থেকে আমি আমার প্রবন্ধকে পবিত্র রাখলাম। কাদিয়ানী

কাদিয়ানী নামটা যে প্রকৃতপক্ষে আহমদী মুসলিম জামাতের নাম নহে, কাদিয়ানী কথাটা যে তাদের সঠিক নাম নয়, ইহা যে একটি স্থানের নাম, এবং ইহা যে নতুন কোন ধর্মও নয় বা খৃষ্টানদেরও শাখা নয়, ইহা যে মৃত প্রায় ইসলামকে সঞ্জীবনী সুধা ঢেলে দিয়ে পুনঃ জীবন্ত করে তুলছে, তা তখন আমি জানতাম না। আমি তাদের মুখে শুনে মনে করলাম যে, হয় তো বা খৃষ্টানদের বহু বিধ শাখার মধ্যে ইহা একটি। কেননা বর্তমান যুগে খৃষ্টান ধর্ম ব্যতীত অন্য কোন ধর্মের প্রচার কার্য নেই। কথার মাধ্যমে আহমদীয়াত গ্রহণ করেছেন এমন কয়েকজনের নামও করলেন তারা। তাদের মধ্যে আমার সুপরিচিত এবং আত্মীয় জনাব মির্জালী আকন্দ বি, এস, সি সাহেব একজন। তাদের প্রশংসাও করলেন পঞ্চমুখে। দোষের মধ্যে এইটুকুই বললেন যে, কাদিয়ানী ধর্ম গ্রহণ করে খুবই খারাবি করে ফেলেছেন। জনাব মির্জালী আকন্দ সাহেবের কথা শুনে ভাবলাম যা হউক তিনি এখন খৃষ্টান তখন তার কাছ থেকে খৃষ্ট ধর্ম সম্বন্ধে অনেক জানতে পারবো। খুব ভালই হলো একজন স্বদেশী খৃষ্টান বন্ধু মিলে গেল। জনাব মির্জালী আকন্দ সাহেবকে খৃষ্টান ভেবেই ঢাকায় এসে সর্বপ্রথমে আমি তাঁর বাসায় গেলাম। তখন তিনি থাকতেন ঢাকেশ্বরী কেন্দ্রীয় কোয়ার্টার জে, ৩নং বাসায়। তখন সন্ধ্যা প্রায় ঘনিয়ে এসেছে। সেদিন তাঁর বাসায় রাত্রি যাপন করলাম। কিন্তু কোন প্রকার আলাপ আলোচনা হলো না তাঁর সাথে। সকাল বেলায় তখনও আমি শুয়ে আছি। চেয়ে দেখি মির্জালী সাহেব 'আল্লাহু আকবর' বলে ফজরের নামায পড়ছেন। তাঁকে এভাবে নামায পড়তে দেখে আমার মনে খটকা লাগলো যে, এ আবার কেমন ধারার খৃষ্টান, খৃষ্টানগণ তো এমনিভাবে নামায পড়ে না। তিনি নামায পড়েই বের হয়ে কোথায় চলে গেলেন জানি না। মনের খটকা যেন ক্রমশঃ প্রকট হতে লাগলো আমার। ভাবলাম এর একটা মীমাংসা না করে কলকাতা বা বোম্বে যাব না। হাত মুখ ধুয়ে চা নাস্তা খেয়ে একটি চেয়ার টেনে নিয়ে বসলাম। চেয়ে দেখি টেবিলের উপর এলোমেলোভাবে পড়ে আছে বেশ কয়েকটি পুস্তক। একটি পুস্তক টেনে নিলাম। পুস্তকটির নাম হাদীসুল মাহদী। লিখেছেন আল্লামা জিল্লুর রহমান সাহেব। আরবী উর্দু লিখা আমি পসন্দ করতাম না। অর্থাৎ তখন আমি কুরআনকে অশ্রদ্ধার চোখে দেখতাম। তাই উক্ত পুস্তকে আরবী উর্দুর সমাবেশ দেখে আমার মন বসতে চাইল না উক্ত পুস্তকের ভিতর। আনমনাভাবে শুধুই ওলট পালট করে যেতে লাগলাম। আরেকবার দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো এমন একটি জায়গায় যেখানে পবিত্র কুরআন এবং হাদীস দ্বারা অকাট্যভাবে খৃষ্টানদের নবী যীশু (ঈসা আঃ)-এর মৃত্যু প্রমাণ করা হয়েছে। শেষ যুগে যাঁর আগমন করার কথা আছে তিনি খৃষ্টানদের যীশু (ঈসা আঃ) নহেন। তিনি হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর উম্মত থেকেই উম্মতি নবী আবির্ভূত হবেন। উক্ত পুস্তকে হযরত ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে প্রথমতঃ আমি বিশ্বাস করতে

পারলাম না। কেননা এ যে নতুন কথা। চোখটাকে ভাল করে কচলিয়ে টচলিয়ে নিলাম। ভুল টুল তো দেখছি না? এই জীবন্ত কথা পেয়ে আমি হতভম্বের মত হয়ে গেলাম। একি স্বপ্ন না সত্য? আমি স্বর্গে আছি অথবা মর্তেই বসে আছি? এই পথই যে মুসলমান জাতিকে জিন্দা জাতিতে পরিণত করে। এই পথই যে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-কে চির জীবন্ত রাখে এবং তাঁর উম্মতগণকে জিন্দা করে। মানবকুল শ্রেষ্ঠ হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) মরে গিয়ে মদিনার মাটির নীচে শুয়ে আছেন। আর খৃষ্টানদের নবী যীশু (ঈসা আঃ) চতুর্থ আসমানে সশরীরে জীবিত আছে, একথা অবলম্বনেই তো লক্ষ লক্ষ মুসলমান খৃষ্টান হয়ে গেছে, যার মধ্যে বহু আলেম ওলামাও রয়েছেন। আমার মন ব্যাকুল হয়ে উঠল আরো জানার জন্য। কলকাতা বা বোম্বে যাওয়া হলো না। উক্ত পুস্তকের নাম খানা নোট করে ফিরে এলাম বাড়ি। তখন মৌলবী মরহুম আবু মূসা সাহেব, ভূতপূর্ব মোয়াল্লেম, মৌলবী আবু তাহের সাহেব, সদর মোয়াল্লেম এবং আরো অন্যান্য ভ্রাতাগণ ত্রিপুরা রাজ্যের বাল্লা নামক স্থান থেকে হিজরত করতঃ সবে মাত্র কটিয়াদী এসেছেন কিন্তু আমার সাথে তাদের কোন পরিচয় ছিল না। তাদের সাথে সাক্ষাৎ করার উদ্দেশ্যেই আমি কটিয়াদী গেলাম। চা পানের উদ্দেশ্যে আমি কোন এক গাঙ্গের ষ্টলে বসেছি। এমন সময় ষ্টলের মালিক বলে উঠলো। আপনার বন্ধু মেন্দি মিয়া কাদিয়ানী হয়ে গেছে। নাম তাঁর শামসুল হক, ডাক নাম মেন্দি মিয়া। তিনি অত্যন্ত দুর্দান্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন। কটিয়াদী বাজার ছিল তার হাতের মুঠোয়। মেন্দি মিয়া কাদিয়ানী হয়ে গেছে শুনে, সাইকেল যোগে আমি তার বাড়ি গেলাম, তখন বেলা দুটো। মেন্দি মিয়া তার খানকার সামনে আম গাছের ছায়ায় জায়নামায পেতে যোহরের নামায পড়ছিলেন। আমি তাকে নামায পড়তে দেখে অবাক হলাম। তিনি আমাকে বললেন, সেই মেন্দি মরে গেছে। অর্থাৎ তিনি তাঁর পূর্ববর্তী নোংরা চরিত্রকে ধুয়ে মুছে পবিত্র হয়েছেন। তখন আহমদী মুসলিম জামাত ছিল হালুয়াপাড়া। প্রেসিডেন্ট ছিলেন মরহুম কুদরত উল্লাহ মুন্সী সাহেব। মেন্দি মিয়ার বাড়ী থেকে দুপুরের খাওয়া দাওয়া সেরে উভয়ে গেলাম হালুয়া পাড়া। উদ্দেশ্য হাদীসুল মাহদী পুস্তকটি সংগ্রহ করা। জনাব মেন্দি মিয়া জনৈক আহমদী ভ্রাতার নিকট থেকে হাদীসুল মাহদী পুস্তকটি সংগ্রহ করে আমাকে দিলেন। পুস্তকটি নিয়ে আমি যখন বাড়ি ফিরলাম তখন রাত আটটা। আমি মনোযোগের সহিত বহুবার পাঠ করলাম পুস্তকটি।

খৃষ্টানদের নবী যীশু (ঈসা আঃ)-এর মৃত্যুর অকাট্য প্রমাণ তো পবিত্র কুরআন করীমে পেলাম কিন্তু এই ব্যক্তি অর্থাৎ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) যে, আল্লাহ্‌র প্রেরিত আখেরী যামানার ইমাম মাহদী ও মসীহে মাওউদ (আঃ)-এর দাবী করেছেন তাঁর সত্যতা নিরূপণ করি কিরূপে, এ সমস্যার সমাধান আমাকে কে করে দিবে?

রাত্রে শুতে যাওয়ার আগে দু'হাত তুলে মহান আল্লাহ্‌তা'লার দরবারে করুণা ভিক্ষা করলাম। হে দয়ালু প্রভু! তোমার এ অধম বান্দাকে তোমার সরল এবং সঠিক পথে

চালিত কর এবং ভ্রান্ত পথ থেকে তুমি অধম দাসকে ফিরায়ে রাখ। এই ব্যক্তি (হযরত মির্যা গোলাম আহমদ আঃ) সত্যই কি তোমার প্রেরিত ইমাম মাহদী কিনা আমাকে চিনিয়ে দাও। কায়মনোবাক্যে তিনবার এমনিভাবে বলে আমি শুয়ে পড়লাম। মহান আল্লাহ্‌তা'লা যেন এই অধম দাসের ডাক শুনলেন, শুধু শুনলেনই না, এই অধমের সাথে কথাও বললেন। গভীর নিশীতে স্বপ্নে দেখলাম। আমি যেন একটি প্রশস্ত বহু পুরাতন কংক্রিট রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি। উক্ত রাস্তাটি অর্দ্ধাংশ লম্বালম্বীভাবে আবর্জনায় পরিপূর্ণ বাকী অর্দ্ধাংশ লম্বালম্বীভাবে সদ্য পরিষ্কার করা হয়েছে এবং হচ্ছে। আমি যেন পরিষ্কার অংশটুকু দিয়ে যাচ্ছি। কিছু দূর অগ্রসর হয়ে দেখি একটি সুগভীর খাল কিন্তু খালটি উত্তীর্ণ হয়ে অপর পারে যাওয়ার কোন সেতু বা অন্য কোন ব্যবস্থা নেই। আমি যেন মহা সংকটে পতিত হলাম, কিরূপে খালটি পার হই। হঠাৎ আকাশ থেকে শব্দ হলো, যেন আল্লাহ্‌তা'লা বলছেন, "কোন ভয় নেই এগিয়ে চলো"। শব্দটি আকাশ থেকে উঠে ঘন্টা ধ্বনির মত পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ব্যাপ্ত হয়ে যেন কোথায় মিলিয়ে গেল। অতপর কিরূপে যে আমি খালটি অতিক্রম করলাম জানি না। অপর পাড়ে গিয়ে দেখি বহুতলা বিশিষ্ট অনেক পুরাতন প্রকাণ্ড একটি বিল্ডিং। অযত্নে ও অবহেলায় যেন তার ইট পাথর দরজা জানালা ইত্যাদি খসে খসে পড়ে যাচ্ছে, এবং আবর্জনাপূর্ণ হয়ে গেছে। আবার যেন হাজার হাজার রাজমিস্ত্রী তুমুল আনন্দে তার মেরামতের কাজে লেগে গেছে। তার দুদিন বা তিন দিন পর স্বপ্নে দেখলাম মানবকুল শ্রেষ্ঠ হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-কে। হুযুর (সাঃ)-এর বয়স যেন পঞ্চান্ন কিংবা ষাট। জ্যোতির্ময় চেহারা অতি সুন্দর পাকা দাঁড়ি। যেন তিনি বেহেশ্‌তে থেকেও কি এক চিন্তার কারণে নিদ্রা যেতে পারেন নি। এতদিনে তাঁর সেই কাজ যেন কারো দ্বারা সমাধা হচ্ছে তাই তিনি নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাচ্ছেন। অতঃপর স্বপ্নে দেখলাম ইমাম মাহদী মসীহে মাওউদ (আঃ) এর দাবী কারক হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-কে। যেন একটি প্রকাণ্ড মাঠ। কিন্তু মাঠের মধ্যে শুধু গরু, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি পশুর পাল। মাঝে মধ্যে বহু দূরে দূরে দণ্ডায়মান দেখতে পেলাম মুষ্টিমেয় মানুষকে। তজ্জন্য সেখানে একটি উচ্চ মঞ্চের উপর সামিয়ানা টানানো হয়েছে। হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) যেন দুইজন ফেরেশ্‌তা সহকারে ভিড় ঠেলে এসে আমার সাথে করমর্দন করলেন।

তবুও আমি বয়াত গ্রহণ করিনি। বিভিন্ন তফসীর আঁওড়াতে লাগলাম। অতঃপর একদিন স্বপ্নে দেখলাম। আমি যেন পবিত্র কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করছি। হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ) আমার সম্মুখ দিয়ে দ্রুত পদে যেন কোথায় যাচ্ছেন। আমার সামনে এসে তাঁর ডান হস্ত উপরের দিকে উঠিয়ে না সূচক অঙ্গুলি সংকেত করলেন। এর অর্থ হলো পবিত্র কুরআন শুধু মৌখিকভাবে পাঠ করলেই চলবে না, বোধগম্য ভাষায় পাঠ করতে হবে। এই স্বপ্নে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)

এর যে ছবি দেখতেছিলাম তা তাঁর আল ওসীয়্যত পুস্তিকার ছবির সাথে হুবহু মিলে যায়। এরপর স্বপ্নে দেখলাম খলীফাতুল মসীহ আওয়াল হযরত নূরউদ্দীন (রাঃ)-কে স্বপ্নে তাঁকে হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ) বলে মনে হয়েছিল আমার। দ্বিতীয় খলীফা হযরত মির্যা বশীরউদ্দিন মাহমুদ (রাঃ)কে স্বপ্নে দেখি পাগড়ি পরিহিত নূরানী চেহারায়। এরপরেও যখন আমি বয়াত গ্রহণ করতে ইতস্ততঃ করছিলাম। তখন কোন কারণবশতঃ আমি ময়মনসিংহ গিয়েছিলাম। রাত্রে শুয়ে আছি ষ্টেশনের পেছনে দিককার গেষ্ট হাউজে। স্বপ্নে দেখি আমার মরহুম পিতা যেন একটি ডাণ্ডা হস্তে আমায় খুঁজছেন, যেন আমি তাঁর অবাধ্য হচ্ছি। অর্থাৎ তিনি আমাকে শীঘ্র বয়াত গ্রহণ করতে তাগিদ করছেন। তখন আমি চিন্তা করলাম বয়াত গ্রহণ করার পরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে। সেদিন শুক্রবার। বুকের ভিতর থেকে কে যেন বলে উঠলো, খোদা তোমার খোদা না কি সমাজ তোমার খোদা। আল্লাহ্‌তা'লার বহু জলন্ত নিদর্শন পেয়ে, হযরত মির্যা গোলাম আহামদ (আঃ)-এর দাবীকে সত্য জেনে, স্বজ্ঞানে সুস্থ শরীরে বয়াত গ্রহণ করলাম। সন ১৯৪৯। জীবনে আল্লাহ্‌তা'লার বহু নিদর্শন পেয়েছি উপরোক্ত নিদের্শনাবলী হলো আহমদীয়াত জীবনের প্রথম।

আসল কথা, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌তা'লা একজন আছেন। তিনি চিরঞ্জীব। বান্দাগণের ডাক তিনি শুনেন ও বান্দার ডাকের উত্তর দিয়ে থাকেন, কিন্তু তা শর্ত শাপেক্ষে। গর্ব অহংকার, আত্মম্ভরিতা, হিংসা দ্বেষ ইত্যাদিকে অন্তর থেকে ধুয়ে মুছে নির্মল নিকলঙ্ক ও পবিত্র অন্তরে তাঁকে ডাকার মত ডাকতে হবে, তবেই তিনি সে ডাকের উত্তর দিয়ে থাকেন। ইসলাম ধর্মের নির্দেশ এই যে, আল্লাহ্‌কে মানতে হবে, রসূল (সাঃ)কে মানতে হবে এবং যুগ-ইমামের নিকট বয়াত করে চলতে হবে। শুধু আল্লাহ্‌ মানি, রসূল (সাঃ)কে মানি কিন্তু যুগ-ইমামের এতায়াত করি না, তাতে আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে প্রকৃত মোমেন হওয়া যায় না। যেমন আল্লাহ্‌তা'লা বলেন, "যারা তওবা করবে এবং নিজেদের সংশোধন করবে এবং আল্লাহ্‌র রজ্জুকে (খেলাফতকে) শক্তভাবে ধারণ করবে এবং শুধু আল্লাহ্‌রই এবাদত করবে তারাই হবে মোমেনদের অন্তর্ভুক্ত এবং আল্লাহ্‌ শীঘ্রই মোমেনগণকে মহা পুরস্কার দিবেন।" (সূরা নিসা)

আমার জীবনে এমন একদিন ছিল, যেদিন কুরআনের আরবী অক্ষর এবং হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর নাম শুনলে আমি নাক ছিটকাতাম। পরম করুণাময় আল্লাহ্‌তা'লা এই অধম দাসের প্রতি রহমতের বারি বর্ষণ করেছেন। এখন আমি আল্লাহ্‌তা'লার একত্বে দৃঢ় বিশ্বাস রাখি, খাতামান্নাবীঈন হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)কে প্রাণ অপেক্ষা ভালবেসে তাঁর প্রতি ঈমান রাখি, আল্লাহ্‌ ও হযরত রসূল করীম (সাঃ)-এর নির্দেশ মত যুগ-ইমামের এতায়াত করে চলি। এমন কোন দিন আমার যায় না, যেদিন বোধগম্য ভাষায় পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত না করি এবং এমন কোন রজনী আমার যায় না যে রজনীতে মানব কুল শ্রেষ্ঠ হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)-এর প্রতি দরূদ পাঠ না করে ঘুমাই, এমবস্থায় কেউ যদি আমাকে বলে যে, তুমি মুসলমান নও, তবে মুসলমান কে?

পাকিস্তানী ভূত ঘাড় থেকে নামানো

আবদুস সামাদ

"কাদিয়ানী সম্প্রদায়কে অমুসলিম ঘোষণার লক্ষ্যে সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে একটি রীট পিটিশন দাখিল করা হয়েছে। গত মঙ্গলবার এই রীট পিটিশনের শুনানি শুরু হয়েছে। বিশ্ব ইসলাম কোরআন-ই-সুন্নী নামক একটি সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক এবং সুপ্রীম কোর্টের অন্যতম প্রবীণ আইনজীবী আলহাজ্ব এবিএম নূরুল ইসলাম পিটিশনটি পেশ করেছেন এবং তিনি নিজেই শুনানি পরিচালনা করেছেন বলে প্রকাশ। কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের বই-পত্র থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেছেন, তাদের সঙ্গে মুসলমানদের নাকি পনেরটি বিষয় মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঃ কাদিয়ানী সম্প্রদায় হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে শেষ নবী হিসেবে স্বীকার করে না। মুসলমানগণ বিশ্বাস করেন যে, শেষ জামানায় দুনিয়ায় ইমাম মেহেদীর আগমন ঘটবে। পক্ষান্তরে তারা বলেন, মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীই ইমাম মেহেদী। মুসলমানগণ বিশ্বাস করেন যে, হযরত ঈশা (আঃ) কে ক্রুশবিদ্ধ করবার পূর্বেই আল্লাহ্ তাঁকে আসমানে তুলে নিয়েছেন। অপরদিকে তারা বলেন যে, তিনি ভারতের কাশ্মীরের শ্রীনগরে ইন্তেকাল করেছেন। সেখানে তাঁর কবর রয়েছে। ইসলামে নামাযের পূর্বে আজান দেয়া অপরিহার্য। পক্ষান্তরে কাদিয়ানীদের জন্য আজান দেয়া নিষিদ্ধ। কারণ আজানের ভেতর হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর নাম উল্লেখ আছে। মুসলমানদের জানাযায় শরীক হওয়া কাদিয়ানীদের জন্য নিষিদ্ধ। মুসলমানদের জামাত ও ইমামতিতেও নামাজ পড়াও কাদিয়ানীদের জন্য নিষিদ্ধ।

মোটামুটি এই হলো রীট পিটিশনের প্রার্থনা। পিটিশনটি বোধ হয় গত মাসের প্রথম সপ্তাহে সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে পেশ করা হয়েছিল যার শুনানি গত মঙ্গলবার থেকে শুরু হয়েছে। গত বুধবার শুনানির দ্বিতীয় দিনে আবেদনকারী এডভোকেট আলহাজ্ব এবিএম নূরুল ইসলামের বক্তব্য পেশের পূর্বে আদালত জানতে চান যে, কাদিয়ানী সম্প্রদায়কে অমুসলিম হিসেবে ঘোষণার আইন প্রণয়ণের জন্য সরকারের প্রতি নির্দেশ দান সংক্রান্ত রুল জারির ক্ষমতা আদালতের আছে কি না। এর জবাবে আবেদনকারী বলেন, সংবিধানের ২-ক অনুচ্ছেদে বলা আছে যে, বাংলাদেশের রাষ্ট্রধর্ম হলো ইসলাম। সংবিধানের ৮ (১-ক) অনুচ্ছেদে বলা আছে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র উপর পরিপূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসই হবে যাবতীয় কার্যাবলীর ভিত্তি। বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ২৯৫-ক ধারায় বলা আছে, কারও ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করা অপরাধ। কাদিয়ানী সম্প্রদায় ইচ্ছাকৃতভাবে মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করেছে। কাজেই উপরের সাংবিধানিক ও আইনগত বিধানের আলোকে আদালতের রুল জারির এখতিয়ার আছে। পক্ষান্তরে ডেপুটি এটর্নী জেনারেল এ কে মজিবুর রহ-

মান বলেন, সংবিধানের ১০২ নম্বর অনুচ্ছেদ মোতাবেক আবেদনকারী সংক্ষুব্ধ বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি নন। তিনি সরকারের কোন আদেশ কিংবা নিষেধের বিরুদ্ধে রীট করেন নি। এছাড়া সংবিধানের ৮ নম্বর অনুচ্ছেদ রাষ্ট্রিয় পরিচালনার মুলনীতির অন্তর্ভুক্ত। ঐ অনুচ্ছেদেই বলা আছে রাষ্ট্র পরিচালনার মুলনীতি আদালতের মাধ্যমে বলবৎ করা যাবে না। কাজেই পেশকৃত রীট পিটিশনটি অচল শেষ অব্দি ধর্মকে আদালত পর্যন্ত টেনে আনা হলো। আসলে এর জন্য দায়ী স্বৈরাচারী এরশাদ। এরশাদ আমলেই পবিত্র ইসলামকে রাষ্ট্রিয় ধর্ম হিসেবে সংবিধানভুক্ত করা হয়েছে। তবে এর মানে এটা নয় যে, রাষ্ট্রের সকল নাগরিকেরই নিজ নিজ ধর্ম ত্যাগ করে দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে হবে কিংবা ইসলামের নীতি-আদর্শ মেনে চলতে হবে। তাছাড়া রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম হলেও বাংলাদেশ ইসলামী প্রজাতন্ত্র নয়। সঙ্গত কারণেই এদেশে অন্যান্য ধর্মের লোকজন বসবাস করবে এবং রাষ্ট্রপ্রদত্ত সকল সুযোগ-সুবিধাও সমানভাবে ভোগ করবে এটা এদেশের সাংবিধানিক সিদ্ধান্ত। এক্ষেত্রে কে কোন ধর্মের অনুসারী কিংবা বিরোধী সেটা নির্ধারণ করা সংবিধানের দায়িত্ব নয়। বরং বাংলাদেশের সংবিধান সকল নাগরিকের নিজস্ব ধর্মকর্মই সমর্থন করে। উপরন্ত একাধিক ধর্মমতের অনুসারী অধ্যুষিত এদেশে ধর্মীয় ব্যাপারে রাষ্ট্রের নাক গলানোও সমীচীন নয়। একমাত্র পাকিস্তান ব্যতীত পৃথিবীর অন্য কোন মুসলমান প্রধান দেশে ধর্মীয় ব্যাপারে বিশেষ করে কোন মুসলমানকে মুসলমান নয় এমন ধরনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে এমন কোন নজীর খুঁজে পাওয়া কঠিন। পাকিস্তানের দুই সরকার প্রধান জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো ও জেনারেল জিয়াউল হক আইন করে সে দেশে কাদিয়ানী সম্প্রদায়কে অমুসলিম ঘোষণা করেছে। শুধু তাই নয়, আল্লাহ্‌ রছুলের নাম উচ্চারণ করাও তাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের লোকেরা অন্যদেরকে আস্‌ সালামু আলাইকুম বলে সালাম দিতে পারবে না বলেও আইন প্রণয়ন করেছে। এর আগে প্রেসিডেন্ট আয়ুব খানের আমলে মওলানা মওদুদীর নেতৃত্বে পাকিস্তান জামাতে ইসলামের দ্বারা পাঞ্জাবে একটি বর্বর ও হৃদয় বিদারক দাঙ্গা সংঘটিত হয় যার নির্মম শিকার হয়েছিল শত শত নারী পুরুষ ও শিশু।

পবিত্র ইসলামের দরজা কারো জন্য বন্ধ নয়। ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্যই এর দরজা অবারিত। সম্প্রীতি, ভ্রাতৃত্ব ও সহানুভূতি হলো ইসলামের শাশ্বত বাণী। সঙ্গত কারণেই পরম করুণাময় আল্লাহ্‌ ও তাঁর রছুলের নামোচ্চারণ সকলের জন্য স্বীকৃত এবং এটা সকল সৃষ্টির ধর্ম। আইনের মাধ্যমে আল্লাহ্‌-রছুলের নাম নেয়া নিষিদ্ধ করা শুধু অন্যের জন্মগত অধিকার হরণ করাই নয় অধর্মও বটে। প্রকৃত অর্থে এটা আল্লাহ্‌ ও রছুলের বিরোধিতা করার শামিল। পরিতাপের বিষয় বাংলাদেশেও একশ্রেণীর লোক যারা নিজেদের ইসলামের সোল এজেন্ট দাবি করেন তারা পাকিস্তানের অনুকরণে এদেশের সরকার এবং আদালতকে বিভ্রান্ত করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছেন।

ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপার। মানুষ ধর্মীয় দিক থেকে অনুগত আল্লাহ্‌র কাছে আর আইনের দিক থেকে রাষ্ট্রের কাছে। তেমনি রাষ্ট্র ও মানুষের ধর্মীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারে না। কেননা এটা মানুষের নয় আল্লাহ্‌র বিধান। এক্ষেত্রে কাদিয়ানীরা মুসলমান কিনা এটা নির্ধারণ করবেন স্বয়ং আল্লাহ্‌, রাষ্ট্র নয়। আর কেউ যদি অমুসলমান হয় নিজেদের মুসলমান দাবি করে তাতে ইসলামের ক্ষতি কোথায়। বিগত চৌদ্দশ' বছর ধরে ইসলামের বিরুদ্ধে অনেক ষড়যন্ত্রই করা হয়েছে? এখনো ইহুদী-খৃষ্টানরা কম বিরোধিতা করছে না। তাতে কি পবিত্র ইসলাম পৃথিবী থেকে বিলীন হয়ে গেছে? বিলীন হয় নি এবং কোন দিন হবেও না। আল্লাহ্‌পাক স্বয়ং বলেছেন, তিনিই পবিত্র কোরআনের হেফাজতকারী। কোরআনের হেফাজত আর ইসলামের হেফাজত একই কথা। কেউ বিরোধিতা করে ইসলামের চুল পরিমাণ ক্ষতি যখন করতে পারে নি তখন ইসলামকে স্বীকার করে কি কেউ এর ক্ষতি সাধন করতে সক্ষম হবে? বরং তাঁদেরই মারাত্মক ক্ষতি হবে।

রীট পিটিশনের আবেদনকারী বলেছেন, কাদিয়ানী সম্প্রদায় হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে শেষ নবী হিসেবে স্বীকার করেন না। তিনি কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের অনেক বই-পুস্তকের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। একজন সাধারণ পাঠক হিসেবে ব্যক্তিগতভাবে আমি বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের বই-পুস্তক পেলে পড়ে থাকি। তাছাড়া পেশাগত কারণেও অনেক কিছুই পড়তে হয়। উপরন্তু অন্য ধর্মগ্রন্থ এবং তৎসম্পর্কীয় বই-পুস্তক অধ্যয়ন করলে নিজের ধর্ম যে শ্রেষ্ঠ তা বুঝতে আরো সহজ হয়। নবী করীম (সাঃ) নিজেও বলেছেন—"এলেম শিক্ষার জন্য প্রয়োজনে চীন দেশে যাও"। এলেম অর্থ জ্ঞান। জ্ঞানার্জনের জন্য নবীজী নিজেই তাঁর উম্মতকে তাগিদ দিয়েছেন। সঙ্গত কারণেই আমিও কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের কিছু বই-পুস্তক পাঠ করেছি। এবং সেগুলো আমার কাছে সংরক্ষিতও আছে। আমি কোথাও পাইনি কাদিয়ানীরা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে শেষ নবী হিসেবে স্বীকার করে না। বরং তারা নবীজীকে খাতা-মান্নাবীঈন হিসেবেই স্বীকার করেন এবং যারা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে শেষ নবী হিসেবে স্বীকার করেন না তাদেরকে কাফের হিসেবে গণ্য করে থাকেন বলে তাদের অনেক বই-পুস্তকে দেখা যায়। শুধু তাই নয়, যারা খোলাফায়ে রাশেদীনের চার খলিফাকে স্বীকার করে না অর্থাৎ যারা একজনকে বাদ দিয়ে তিনজনকে স্বীকার করেন, কিংবা একজনকে স্বীকার করেন, তিনজনকে স্বীকার করেন না, তাদেরকে কাদিয়ানীরা অমুসলিম মনে করেন। (শিয়া সম্প্রদায় হযরত আলী (রাঃ) কে ছাড়া অন্য কাউকে স্বীকার করে না)।

জনাব এবি এম নুরুল ইসলাম আজান সম্প্রর্কে বলেছেন। এ ব্যাপারে আমি কিছু বলতে চাই না। বকসীবাজারস্থ কাদীয়ানী মসজিদ সুপ্রীম কোর্টের অতি নিকটে। নামাজের পূর্বে আজান দেয়া হয় কি না তা সহজেই উদ্ধার করা সম্ভব। ইমাম মাহদী সম্পর্কে আমরা বিশ্বাস করে

থাকি তিনি শেষ যুগে ইমাম হিসেবে আসবেন। কাদিয়ানীরা বিশ্বাস করেন, এখনই শেষ যুগ এবং ইমাম মাহদী এসে গেছেন। সুতরাং বিষয়টি অত্যন্ত জটিল এবং বিতর্কিত। কারণ এটাই শেষ যুগ কি না তা হলফ করে বলার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো নেই। হযরত ঈশা (আঃ) সম্পর্কে একটি কথা সত্য যে, তিনি ক্রুশবিদ্ধ হননি। আমরা বিশ্বাস করি ক্রুশবিদ্ধ হবার আগেই আল্লাহ্ তাকে আকাশে উঠিয়ে নিয়েছেন আর ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তে তিনি ভারতের শ্রীনগরে ইনতেকাল করেছেন। আর অন্যদের ইমামতিতে তারা নামায পড়ে না বলে তিনি যে কথা বলেছেন তা আসলেই তাদের নিজস্ব ব্যাপার। তবে তিনি তার অজান্তেই একটা কথা স্বীকার করেছেন যে, কাদিয়ানীরা নামায আদায় করে। সুতরাং নামায আদায় করলে তারা নিজেদের মুসলমান হিসেবে দাবি করতে পারবেন কি না তা একমাত্র আল্লাহ্‌তা'লাই বলতে পারেন।

একটা বিষয়ে আশ্চর্য না হয়ে পারছি না এই জন্য যে, জনাব এবি এম নুরুল ইসলাম একজন বিজ্ঞ আইনজীবী ও পবিত্র ইসলামের নিবেদিত খাদেম হয়েও এ বিষয়ে তিনি আইনের আশ্রয় নিয়েছেন। অথচ বিষয়টি ধর্মীয় বিধানমতেই মীমাংসা করা সম্ভব বলে আমি মনে করি। মানুষের তৈরী আইন দ্বারা এর মীমাংসা সম্ভব নয়। তাহলে ৭২ ফেরকার কেউই আর মুসলমান থাকবে না। এক ফেরকার লোকেরা অন্য ফেরকার বিরুদ্ধে আদালতে যাবে। একে অপরের প্রতি হবে মারমুখী। ফলে রাষ্ট্র পরিচালনা দুরূহ হয়ে পড়বে। দেশের আদালতগুলোও ফৌজদারী এবং দেওয়ানী মামলা বাদ দিয়ে কেবল ধর্মীয় সংকট নিরসনে ব্যস্ত হয়ে পড়বে। তাই আমার অনুরোধ যারা আদালতের শরনাপন্ন হয়েছেন দয়া করে আপনারাই একটি ধর্মীয় বাহাছের ব্যবস্থা করুন। মুসলমানত্ব প্রমাণ করার জন্য সেই বাহাছে কাদিয়ানীদেরও ডাকুন। তারা যদি তা প্রমাণ করতে ব্যর্থ হন তাহলে কোর্ট-কাচারী আর উকিল মোকতারের প্রয়োজন হবে না। সেই বাহছেই সিদ্ধান্ত হবে তাদের ভবিষ্যৎ।

আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, বাংলাদেশ একটি দরিদ্রতম দেশ। এদেশের শতকরা ৯৫ জন মানুষই মুসলমান। সৃষ্ট ৭২টি ফেরকার মধ্যে এখানেও একাধিক ফেরকার মুসলমান রয়েছেন। রয়েছেন আরো ৫ ভাগ অন্যান্য ধর্মের লোকজনও। সুতরাং আমরা সকলেই এদেশের নাগরিক। দরিদ্র দেশটির অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে ধর্ম-বর্ণ-গোত্র তথা দলমত নির্বিশেষে সকলেরই কিছু করণীয় রয়েছে। রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় কাদা ছোঁড়াছুড়ি যদি চলতে থাকে তাহলে এদেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই রাজনৈতিক ও ধর্মীয় স্থিতিশীলতা আজকে অত্যন্ত অপরিহার্য। সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প, রাজনৈতিক বিশৃখলা এবং ধর্মীয় উগ্রতা পরিহার করা প্রতিটি নাগরিকের নৈতিক দায়িত্ব। আশা করি দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে আমরা সকলেই ধর্মীয় সহনশীলতা প্রদর্শনে সচেষ্ট হবো"।

(দৈনিক লাল সবুজ-এর ১০-৪-৯৩ তারিখের সংখ্যার সৌজন্যে)

চকোলেট-চুইংগাম

বিজ্ঞান ভিত্তিক রম্য রচনা

খোকা-খুকু সোনা মণিরা আমার ! চকোলেট-চুইংগাম-টফি খাওয়ার বায়নায় তোমরা যারা নাছোড়বান্দা—তাদেরকেই বলছি। এগুলো খুবই তোমাদের প্রিয়, তাই না ? চুইংগাম মুখে পুরলে প্রথমে মিষ্টি মিষ্টি স্বাদ পেয়ে পরে একটু ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব এবং সবশেষে মুখের মধ্যে গামটি লেগে থাকে আঠার মতো। কেউ কেউ এটি দিয়ে বেলুন বানিয়ে আনন্দে ফুর ফুর করে ওড়াও। গাম মুখে থাকলে নাকি গলা শুকিয়ে যায় না। খেলার সময়, দৌড়াবার সময় মুখের ভেতর গাম থাকলে নাকি বাড়তি শক্তি পাওয়া যায়। আর রঙিণ চকোলেট টফি খেয়ে ঠোঁট মুখ রঙিণ করাতে একটা নাকি অন্যরকম আনন্দ ও আমেজ রয়েছে, রয়েছে অতিরিক্ত উৎসাহের যোগান—কিন্তু আসলেই কি তাই ? তার আগে আমাদের মূল্যবান দাঁতের গঠনটুকু জেনে নেওয়া যাক।

দাঁত হলো চিবানোর যন্ত্র যা চোয়ালে আটকানো থাকে। ছোট বেলা মানুষের একবার দাঁত পড়ে গিয়ে আবার ওঠে—সেটাই স্থায়ী দাঁত। সংখ্যায় স্থায়ী দাঁত ৩২টি। কিন্তু ৬ মাস হতে ২ বৎসরের মধ্যে যে ২০টি দাঁত ওঠে তাদের দুধ-দাঁত বলে—এরা অস্থায়ী। ৬/৭ বৎসর হতে এগুলো পড়তে শুরু করে দেয় আর পর্যায়ক্রমে স্থায়ী দাঁত গজায়। ১৭—২৫ বৎসরের মধ্যে ৩২টি দাঁত গজানো সম্পূর্ণ হয়। সর্বশেষ দাঁত দু'টিকে আক্কেল দাঁত বলে—এদু'টি অনেকেরই গজায়, কারও আবার গজায় না। প্রতিটি দাঁতের তিনটি অংশ : (১) মুকুট (২) গ্রীবা ও (৩) মূল গ্রীবাকে ঘিরে থাকে কোমল কলা বা মাড়ি-এর মুক্ত ও আবদ্ধ অংশ রয়েছে।

বন্ধুরা, এসো জানি চকোলেট-চুইংগাম এ গঠনের দাঁতের বেলায় কতটুকু নিরাপদ। এদের গঠন উপাদানগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়—এগুলোতে যে মিষ্টি স্বাদ আছে খুব কম ক্ষেত্রেই সেখানে চিনির ব্যবহার হয়। মিষ্টি স্বাদের জন্যে যে জিনিষগুলো ব্যবহৃত হয় তাদের নাম অ্যাসপার্টেম, সাইক্লামেট এবং স্যাকারিন। এদের ব্যবহার বিপজ্জনক। প্রথম দু'টি ফ্রান্স, আমেরিকা ও গ্রেট ব্রিটেনে নিষিদ্ধ। স্যাকারিন ব্যবহারে যে টিউমার হয় তা প্রমাণিত।

সচরাচর কতগুলো জীবাণু (ব্যাকটেরিয়া) দাঁতের গোড়ায় সুখের বাসা বাঁধে। চিনি জাতীয় এসব মিষ্টি এদের সুখাদ্য। এগুলো পেলে জীবাণুগুলো দ্রুত বৃদ্ধি লাভ করে অগুণতি সংখ্যায়।

এগুলো খাওয়ার ফলে যাতে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব তৈরী হয় সেজন্যে মিশানো হয় রাসায়নিক যৌগ ক্যাজেপিটল; এটি নিরাপদ কিনা সে সন্দেহ এখনো যায়নি।

চকোলেট-চুইংগামের টফির রঙের জন্য ব্যবহৃত হয় টাইটেরিয়াম ডাইঅক্সাইড, টারট্রাজিন আমারনাথ এরিথ্রোসিন এবং ইণ্ডিগা কারমিন। এগুলোর ব্যবহার সম্পর্কে স্বাস্থ্য সচেতন দেশগুলোতে 'রেড সিগনাল' (সতর্ক সংকেত) দেয়া আছে। এগুলো শরীরে এলার্জি ও অস্বস্তিভাব সৃষ্টি করে।

এছাড়াও চুইংগাম যাতে সহজে জাড়িত হয়ে গলে না যায় তার জন্যে জারণরোধী যৌগ ব্যবহার করা হয়। সাধারণতঃ যে ডোজে চুইংগামে এই জারণরোধী ব্যবহার করা হয় তাতে মেয়েদের বেশী ক্ষতি হতে পারে এবং পরে তাদের বিকালাঙ্গ শিশুর জন্ম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

চুইংগামে মূল যে বস্তুটি থাকে তাহলো গামবেস—এতে আছে ৪০ রকম রাসায়নিক যৌগ আমিষ ও খনিজ। মাথা ঘামানোর বস্তুটি হলো খনিজ হাইড্রোকার্বন-এর পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে না রাখতে পারলে বিষাক্ত পর্যায়ে চলে গিয়ে শরীরকে বেজায় বিপদে ফেলে। একারণে চুইংগাম খেলে কখনও তার শেষটা গিলে ফেলা উচিত নয় অথবা চুইংগাম খাবার সময় অন্য কোন খাবার খাওয়া ঠিক নয়।

এবার দেখি চকোলেটের ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে। প্রায়—দেড়শো বছর আগে উনবিংশ শতাব্দির মাঝামাঝিতে ফ্রাই অ্যাণ্ড সন্স কোম্পানী প্রথম চকোলেট তৈরী করেছিলো। কতগুলো পরিচিত চকোলেট হলো ক্যারামেল, ক্যাডবেরী নেসলে, মারস, কিটক্যাট, ব্লাক ম্যাজিক, কোয়ালিটি স্ট্রিট, সম্মার্টিজ ইত্যাদি। মজার কথা বৃটেনে একটি চকোলেট সোসাইটি রয়েছে। এর প্রতিষ্ঠাতা নিকোলা পোর্টার নিজেই চকোলেট সম্পর্কে অভিযোগ করেছেন। ক্যাডবেরী, মার্স ও নেসলে'র কর্মকর্তাগণও নীরব থাকেন নি। তাদের কথা হলো ভাল চকোলেট তৈরী করা একটি নান্দনিক (সুকুমার) শিল্প (Super art)। এটি শুধুমাত্র ইণ্ডাষ্ট্রি নয়। অবশ্য স্বাস্থ্যসম্মতভাবে প্রস্তুত চকোলেট যে বাজারে নেই, তা কিন্তু নয়। কিন্তু সেটি অধিকাংশেরই ধরা ছোঁয়ার বাইরে।

অষ্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন বিজ্ঞানী চকোলেটের উপর গবেষণা করে ইদানিং সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন— 'চকোলেট খেলে দাঁতের ক্ষয় হয়।'' শুধু চকোলেট চুইংগামই বা কেন? যে কোন মিষ্টি জাতীয় খাবার পরেই দ্রুত দাঁত-মুখ পরিষ্কার করে

ধুয়ে ফেলা উচিত। মিষ্টি ও দুধ খেতে খেতে কখনও ঘুমিয়ে পড়া উচিত নয় (দুধ দাঁতের ছোট্টরা ছাড়া)। দাঁত ব্রাশ দিয়ে (পরিষ্কার) করে তবেই বিছানায় যাবে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ খাবার-দাবারের ব্যাপারে অনেক জরুরী কথা বলেছেন। যেমন "হে মানব মণ্ডলী! পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে উহা হইতে হালাল এবং পবিত্র (হালালান্ তাইয়েবান) জিনিষ খাও এবং শয়তানের পথ অনুসরণ করিও না, নিশ্চয় সে আমাদের প্রকাশ্য শত্রু" (২:১৬৯)। তাইয়েবান মানে ভাল, পবিত্র, পরিমাণ মতো, রুচিসম্মত ও স্বাস্থ্যের জন্যে উপযুক্ত; এই শর্তের জন্য অনেক হালাল খাদ্যও অনেকের জন্যে স্বাস্থ্যগত কারণে নিষিদ্ধ হয়ে পড়ে। তাই, শুধু হালাল হলেই চলবে না বরং স্বাস্থ্যের উপযোগী হলেই তবে কোন খাদ্য গ্রহণ করা বুদ্ধিমানের কাজ।

আর ছোট্ট বন্ধুরা! দাঁত পড়ে গিয়ে ফোক্‌লা হলে শুধু যে মিষ্টি হাসি ও সুন্দর কথা বলতে অসুবিধে হবে (দাঁতের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে যাবে বলে) তাই কিন্তু নয়—মাংস, মাছের মুড়ো থেকে শুরু করে তুমি মজার মজার শক্ত কোন জিনিসই খেতে পারবে না। ফলে সমস্ত শরীরেই বিভিন্ন জিনিষের ঘাট্‌তি দেখা দিবে ও আস্তে আস্তে রোগাক্রান্ত হয়ে ভয়ানকভাবে অক্কা পেতে হবে অকালেই। তাই চকোলেট-চুইংগাম, টফি খাওয়ার আগে নিজেই আপন মনে ভাবো—এটি না খেলেও তো চলে। তার বদলে যে কোন টাটকা টস্‌টসে ফল খাও। আমাদের শ্রদ্ধেয় কৃষিবিদ ন্যাশনাল আমীর সাহেবের কথায়—"ফল কখনও বিফলে যায় না"।

—মেডিকো মামা

সূত্র: বিভিন্ন মেডিকেল জার্নাল ও টেক্সট

সিরাতুন্‌নবী (সাঃ) জলসা উদযাপন

আহমদীয়া মুসলিম জামাত মাহিগঞ্জের উদ্যোগে গত ২৩শে এপ্রিল রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ স্থানীয় মসজিদ প্রাঙ্গণে সিরাতুন্নবী (সাঃ) জলসার আয়োজন করা হইয়াছিল। উক্ত জলসায় হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর জীবনী সম্পর্কে বিভিন্ন দিক নিয়ে অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা পেশ করেন সর্ব জনাব শহীদুল ইসলাম, আমীর হোসেন, (মোয়াল্লেম) ডাঃ নাজির হোসেন, আবদুল গনি, নূর উদ্দিন আহমদ, ইউনুছ মিয়া, প্রেসিডেন্ট, মমতাজ উদ্দিন আহমদ (প্রেঃ, রংপুর) মাহবুব উল ইসলাম (বিঃ কাঃ), হাবিবুর রহমান, খালেদুল ইসলাম এবং সবশেষে সমাপ্তি ভাষণ পেশ করেন সভার সভাপতি জনাব উমর আলী (রেজা কায়েদ)।

মোহাম্মদ আমীর হোসেন
মোয়াল্লেম, আঃ মুঃ জাঃ মাহিগঞ্জ

সংবাদ

হুযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক গরীব পরিবারের মেয়েদের বৈবাহিক আয়োজনে অংশ গ্রহণ করার তাহরীক

গত ৯ই এপ্রিল, '৯৩ তারিখের খুৎবা জুমুআয় হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আই)ঃ জামাতের সদস্যদের গরীব পরিবারের মেয়েদের বিবাহে সাহায্য করার জন্যে একটি তাহরীক করেছেন। তিনি ধনী ও মধ্যবিত্তদের নসীহত করে বলেছেন যে, তারা যেন তাদের মেয়েদের বিবাহের খরচের দশ ভাগের এক অংশ অথবা পাঁচ ভাগের এক অংশ গরীব মেয়েদের বিবাহের জন্যে নির্দিষ্ট করে নেন। হুযুর (আইঃ) বলেন, আজ আমার স্ত্রীর মৃত্যুর এক বছর গত হলো। তাঁর এই মনোবাসনা ছিল যে, একটি গরীব মেয়ের বিবাহ নিজের খরচে সম্পাদন করবেন। আমি তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর ঐ ইচ্ছাকে পূর্ণ করেছিলাম এবং এক জনের পরিবর্তে চার জনের বিবাহের খরচ বহন করে তাদের বিবাহ সম্পাদন করেছি। হুযুর (আইঃ) বলেন, আমি গরীব মেয়েদের বিবাহের জন্যে জামাতের সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এমন বহু গরীব পরিবার রয়েছে যাদের মেয়েরা বিবাহের বয়সে উপনীত হয় কিন্তু অর্থের অভাবে অভিভাবকগণ তাদের বিবাহ দিতে পারেন না। মাতাপিতা আত্মমর্যাদাবোধের কারণে কারও কাছে হাত পাতেন না। কিছু সংখ্যক এমন লোকও রয়েছেন যারা খলীফায়ে ওয়াক্তকে লিখে জানান আবার অনেকেই জানান না। হুযুর (আইঃ) বলেন, এরূপ সাহায্য গোপনে হওয়া প্রয়োজন। আমীর এবং প্রেসিডেন্টগণ যেন এ বিষয়টি নিজেদের হাতে রাখেন। যে সকল ব্যক্তি গরীবদের বিবাহে সাহায্য করতে চান তারা যেন আমীর এবং প্রেসিডেন্ট সাহেবদের সাথে যোগাযোগ করেন। এবং তাদের মাধ্যমে সহযোগিতার হাত বাড়ান। আর কেউ যদি সরাসরি সাহায্য করতে চান তাহলে তিনি যেন সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে সৃষ্টি করেন এবং সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে গোপনে সাহায্য করেন।

(ভূ-উপগ্রহের মাধ্যমে শ্রুত খুতবার আলোকে)

লণ্ডন সালানা জলসা '৯৩

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)-এর নির্দেশক্রমে লণ্ডন সালানা জলসার '৯৩-এর তারিখ নির্ধারিত হয়েছে ৩০-৩১ জুলাই ও ১লা আগষ্ট। জলসার সার্বিক সফলতার জন্য সকলের নিকট দোয়ার অনুরোধ করা যাচ্ছে।

বাংলাদেশ থেকে যারা এবারকার জলসায় যোগদান করতে ইচ্ছুক তাদেরকে ৩০-৫-৯৩ তারিখের মধ্যে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের বরাবরে দরখাস্ত করতে বলা হচ্ছে। দরখাস্তের সাথে নিম্নলিখিত কাগজপত্র গ্রথিত থাকতে হবে ঃ

১। বিস্তারিত জীবন-বৃত্তান্ত। দরখাস্তকারী জন্মগতভাবে আহমদী না হলে বয়াতের তারিখ দরখাস্তে অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।

২। পাসপোর্ট সাইজের ৪ (চার) কপি (সাদা-কালো বা রঙ্গিন) ছবি।

৩। পাসপোর্টের ২টি ফটো কপি।

৪। স্থানীয় আমীর/প্রেসিডেন্ট ও স্থানীয় কায়েদের সুপারিশ পত্র এবং তৎসহ সংশ্লিষ্ট চাঁদা আদায়ের সার্টিফিকেট।

দরখাস্তকারীকে প্রাথমিকভাবে ৮-৬-৯৩ তারিখে নিম্নোক্ত কমিটির সামনে একটি সাক্ষাৎকারে মিলিত হতে হবে। সাক্ষাৎকারের সময় বিকেল ৩-০০ টা।

১। জনাব এ, টি, এম, হক	কনভেনর
২। জনাব বশীর উদ্দিন আফজাল আহমদ খান চৌধুরী	সদস্য
৩। মৌলানা সালেহ আহমদ	সদস্য

আহমদী বার্তা

কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণার দাবিতে রীট পিটিশন খারিজ

"(সুপ্রীম কোর্ট সংবাদদাতা) সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ গতকাল বৃহস্পতিবার এক রায়ে কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণার দাবিতে আবেদনকারী আলহাজ্ব এ বি এম নুরুল ইসলামের রীট পিটিশনটি প্রাথমিক শুনানির পর খারিজ করেন। আবেদনকারী নিজেই তার রীট পিটিশনের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন। তিনি তার বক্তব্যে বলেন, যে কাদিয়ানীরা রাষ্ট্র ধর্ম ইসলামের ভুল ব্যাখ্যা করেছে। কাজেই আইনের মাধ্যমে সরকার নির্দেশ দেবেন যাতে কাদিয়ানীরা ইচ্ছাকৃতভাবে ইসলামের অপব্যাখ্যা না করে। এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, যে কারও ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। সরকারের বিরুদ্ধে রীট পিটিশনের কোন হেতু না থাকায় ডিভিশন বেঞ্চ তা সরাসরি খারিজ করেন।

আবেদনকারীর বক্তব্য শোনার পর বিচারপতি মোঃ আবদুল জলিল ও বিচারপতি মোহাম্মদ ফজলুল করিম রীট পিটিশনটি খারিজের আদেশ দেন। আবেদনকারীকে সহায়তা করেন এডভোকেট মোঃ নওশের আলী মোল্লা"।

(দৈনিক সংবাদ-এর ১৬-৪-৯৩ তারিখের পত্রিকার সৌজন্যে)

শুভ বিবাহ

আলহামদুলিল্লাহ্, আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা মুসাম্মাত হালীমা সাদেকা (লাকী)-এর শুভ বিবাহ চট্টগ্রাম নিবাসী জনাব সৈয়্যদ সোলায়মান সাহেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র সৈয়্যদ হাসান মাহমুদ মিঞার সহিত দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা হক মোহরানায় ৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৩ তারিখে সুসম্পন্ন হয়। বিবাহ পড়ান রাবওয়া হতে আগত সম্মানিত প্রতিনিধি জনাব মাওলানা

হাফেয মুযাফ্‌ফর আহমদ সাহেব। সকল আহমদী ভাই বোনের নিকট আমি দোয়ার আকুল আবেদন করছি যেন পরম করুণাময় আল্লাহ্‌ আমাদের সকলের জন্যই এই বিবাহকে সর্বাঙ্গীণভাবে সুখী, সুন্দর ও বরকতপূর্ণ করেন।

মাওলানা আবদুল আযীয সাদেক
সদর মুরব্বী

সন্তান লাভ

গত ১২ এপ্রিল '৯৩ সোমবার বিকাল ৩-১০ মিনিটে ঢাকাস্থ হলিফ্যামিলী হাসপাতালে আমাদের এক পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করিয়াছে (আলহামদুলিল্লাহ)। হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) ইতিপূর্বে উক্ত নবজাতককে ওয়াক্‌ফে নও স্কীম-এর অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। তাহার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ুর জন্য জামাতের সকলের নিকট খাস দোয়ার আবেদন করছি।

মোঃ সিরাজুল ইসলাম ও
মিসেস মরিয়ম সিদ্দীকা
গ্রীন রোড, ঢাকা

দোয়ার এলান

আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশের নায়েব ন্যাশন্যাল আমীর (৩) এবং পাক্ষিক আহমদীর নির্বাহী সম্পাদক আলহাজ্জ এ, টি, চৌধুরী ভারতের উড়িষ্যায় কয়েকটি জলসায় যোগদানের জন্য ঢাকা ত্যাগ করেছেন। তিনি সকলের নিকট দোয়া প্রার্থী। আল্লাহ্‌তা'লা যেন তাঁর এই সফরকে সার্বিকভাবে বাবরকত করেন।

আহমদী বার্তা

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ব্রাহ্মণবাড়িয়া-এর অন্যতম প্রবীণ আহমদী হলেন জনাব ওলীউর রহমান মোল্লা। তিনি দীর্ঘ দিন যাবৎ তদীয় মেঁড়াইলস্থ বাসভবনে বার্ধক্যজনিত কারণে শয্যাশায়ী রয়েছেন। বর্তমানে তাঁর বয়স নব্বই এর ওপরে। তাঁর রোগ মুক্তির জন্য সকলের নিকট দোয়ার আবেদন করা যাচ্ছে।

আফযালুর রহমান রিপন (ক্রোড়া)।

শোক সংবাদ

অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জানাইতেছি যে, চট্টগ্রাম নিবাসী সৈয়্যদ শামসুল আলম সাহেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র সৈয়্যদ মোহাম্মদ মারুফ, প্রোগ্রাম অর্গানাইজার, চট্টগ্রাম পোর্ট ট্রাষ্ট, বিগত ১৭ই এপ্রিল, ১৯৯৩ ইং তারিখ রোজ শনিবার ভোর ০১'১৫ ঘটিকার সময় নিজ বাস ভবনে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে আকস্মিকভাবে মাত্র ৩৫ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। (ইন্না ... ... রাজেউন।) মৃত্যুকালে তিনি পিতা-মাতা, ভাই-বোন, স্ত্রী ও

৫ বৎসর বয়সের ১ পুত্র সন্তানসহ অনেক গুণগ্রাহী রেখে যান। তাকে চট্টগ্রামস্থ মুরাদপুর আহমদীয়া গোরস্থানে দাফন করা হয়। আমরা তার আত্মার মাগফেরাত কামনা করি। উল্লেখ থাকে যে, তিনি সরাইল জামাতের প্রেসিডেন্ট মীর মোহাম্মদ সফি সাহেবের জ্যেষ্ঠ জামাতা ছিলেন।

মোহাম্মদ এহসান জুসেফ
ঢাকা

আমরা গভীর দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জানাচ্ছি যে, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, নারায়ণগঞ্জের অন্যতম প্রবীণ সদস্য, আমাদের শ্রদ্ধেয়, প্রাণাধিক প্রিয় বাবা জনাব মৌলভী মোঃ আনোয়ার আলী সাহেব গত ৭ই মার্চ ১৯৯৩ ইং রোজ রোববার ভোর ৪ টায় নারায়নগঞ্জ আধুনিক হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ... ... রাজেউন)। মৃত্যুর আধঘন্টা পূর্বে তিনি হঠাৎ করেই শ্বাস-কষ্ট অনুভব করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। উল্লেখ্য যে, তাঁর হৃদয়ে আল্লাহ্‌তা'লার এল্‌কা থেকে তিনি তাঁর মৃত্যুর যে নিদর্শনের কথা বলে যান তা ঠিক ঠিক মিলে যায়।

মরহুম মৌঃ আনোয়ার আলী ছিলেন দীন ইসলামের একনিষ্ঠ সেবক, সিলসিলা আহমদীয়ার আত্মনিবেদিত অক্লান্ত কর্মবীর খাদেম, সর্ববস্থায় নিয়মিত তাহাজ্জুদগুযার, ইবাদত ও দোয়ায় আত্মবিগলিত প্রাণ। পরম বিনয়ী, নিরহংকার, সংবেদনশীল, দীনের স্বার্থে আত্মাভিমানী, রসম ও রেওয়াজের ঘোর বিরোধী, জামা'তের সর্বমুখী উন্নতির জন্য উচ্চাকাঙ্খী, নিযামে খিলাফতে নিবেদিত প্রাণ ও অতন্দ্র প্রহরী। তিনি ওসীয়্যতকারী ছিলেন এবং তাঁর আয়ের দশমাংশ ইসলামের খেদমতের জন্য ওয়াক্‌ফ করে যান।

প্রত্যহ কুরআন পাঠ ও হাদীস পাঠ ছাড়াও হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর কিতাবাদী এবং সিলসিলার কিতাব ছিল তার চিরসংগী। তিনি রাবওয়া ও কাদীয়ান থেকে প্রেরিত "আল ফযল" ও "বদর" এর নিয়মিত গ্রাহক ও পাঠক ছিলেন। বস্তুতঃ সুলতানুল কলমের একজন একনিষ্ঠ সৈনিক ছিলেন তিনি।

তিনি ছিলেন যেমনই মিষ্টভাষী, উচ্চপর্যায়ের সুবক্তা, তেমনি শক্তিশালী ও সিদ্ধহস্ত লেখক। তাঁর লেখা কাব্যগ্রন্থ "বাগে আহমদ" এর দু'টি সংস্করণ ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও তিনি আরবী ব্যাকরণের বই এবং অন্যান্য বিষয়ে বিভিন্ন পুস্তকাদি লিখেন যা যন্ত্রস্থ রয়েছে। তিনি আরবী, উর্দু, ফার্সী, বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। এছাড়াও তিনি সিন্ধি ও পুস্তু ভাষাও জানতেন। উল্লেখিত ভাষায় তিনি ইসলামের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর বিভিন্ন লেখা অনুবাদ করেন।

মৌঃ আনোয়ার আলী মৃত্যুকালে ২ স্ত্রী, ১০ পুত্র, ৭ কন্যা সহ বহুগুণগ্রাহী রেখে যান। আল্লাহ্‌তা'লা যেন তাঁর আত্মাকে স্বীয় মাগফিরাত ও রহমতের চাদরে আবৃত করে জান্নাতুল ফেরদাউসের উচ্চাসনে স্থান দান করেন এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সবাইকে

ধৈর্য ধারণের তৌফীক দান করেন—এজন্য সকল আহমদী ভাই-বোনদের নিকট খাস দোয়ার আবেদন করছি।

মরহুমের পক্ষ থেকে পাক্ষিক আহমদী খাতে দোয়ার জন্যে ১০০/- টাকা চাঁদা দেয়া হয়েছে।

মরহুমের সন্তানগণ-এর পক্ষে—

জামাতা **কামাল পাশা**
নারায়নগঞ্জ

আমার মা গত ২৪-৪-৯৩ ইং রোজ শনিবার রাত্র অনুমান ১২টায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। (ইন্নালিল্লাহে ... .. রাজেউন)। তিনি ৮৫ বৎসর বয়সে ইন্তেকাল করেন। নিজ বাসভবনে কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি মারা যান। আমার মার জন্য সকলে খাসভাবে দোয়া করিবেন। আল্লাহ্‌তা'লা যেন মাকে বেহেশেত বাসী করেন।

গোলাম হোসেন
প্রেসিডেন্ট, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, মুন্সীগঞ্জ

এক প্রজন্মের শেষ ব্যক্তিটিও অন্তর্ধান করলেন

আমরা অতি দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জানাচ্ছি যে, আহমদীয়া মুসলিম জমাতের প্রথম আমীর হযরত সৈয়্যদ মোহাম্মদ আবদুল ওয়াহেদ (রহঃ)-এর কন্যা পাবনা নিবাসী মরহুম মোহাম্মদ ইয়াসীন সাহেবের স্ত্রী এবং মোহতারম মোহাম্মদ ইয়ামীন সাহেবের মা সৈয়্যদা পারসা বেগম সাহেবা গত ১৯-৪-৯৩ তারিখ দিনগত রাত্র ৮-১০মিঃ তাঁর পুত্রের নিউ বেইলী রোডস্থ বাস ভবনে ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহে ... ... রাজেউন)।

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ-এর মজলিসে আমেলা গত ২৪-৪-৯৩ তারিখে এক জরুরী সভায় মিলিত হয়ে মোহতারেমা সৈয়্যদা পারসা বেগম সাহেবার মৃত্যুতে নিম্নলিখিত শোক প্রস্তাব গ্রহণ করে ঃ

"আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশের পুরোধা হযরত সৈয়্যদা মোহাম্মদ আবদুল ওয়াহেদ সাহেব (রহঃ)-এর কন্যা ও মোহতরম মোহাম্মদ ইয়ামীন সাহেবের আম্মা গত ১৯শে এপ্রিল '৯৩ রোজ সোমবার দিবাগত রাত্র ৮-১০ মিঃ এর সময়ে ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহে ... ... রাজেউন)। মরহুমা পাবনা নিবাসী আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশের অন্যতম পথিকৃত মরহুম মোহাম্মদ ইয়াসীন সাহেবের পুণ্যবতী স্ত্রী। তাঁর মৃত্যুতে আমরা গভীরভাবে মর্মাহত ও শোকাভিভূত। আমরা জামাতের প্রতি তাঁর ঐকান্তিক উৎসাহ ও নিষ্ঠাবান কুরবানীকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি। তাঁর মৃত্যুতে জামাত এক প্রজন্মের শেষ ব্যক্তিটিকে হারালো যার পুণ্যময় স্মৃতি বাঙ্গালী আহমদীদের হৃদয়ে চির-জাগরূক থাকবে।

আমরা তাঁর রূহের মাগফেরাত কামনা করি এবং দোয়া করি যেন আল্লাহ্‌তা'লা মরহুমার রূহকে জান্নাতুল ফেরদৌসের উচ্চ মোকামে স্থান দেন। মরহুমার পুত্র এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যবর্গকে যেন আল্লাহ্‌তা'লা 'সাব্‌রে জামীল' দান করেন, এবং অনাগত ভবিষ্যতে বংশ পরাম্পরায় আহমদীয়াতের জন্যে মরহুমার ত্যাগ ও কুরবানী তাদের মধ্যে সঞ্চারিত থাকে"।

১৪০০ সাল

সম্পাদকীয়ঃ

হিজরী সনের শুরু ৬২২ খৃষ্টাব্দ থেকে। মোঘল বাদশাহরা ভারতে এই হিজরী কমরী সাল অনুযায়ীই কার্য পরিচালনা করতেন। কিন্তু চান্দ্র হিসাবে একটি অসুবিধা দেখা দেয়। সেই অসুবিধাটি হল এই মাসটি নির্ভর করে চাঁদ দর্শনের উপর। চাঁদ কখনও ২৯ এবং কখনও ৩০দিনে হয়। তাই চান্দ্র মাস বিভিন্ন ঋতুতে ঘুরে ঘুরে আসে। ফলে এর তারিখ বৎসরের কোন নির্দ্ধারিত সময়ে আসে না। বাদশাহ আকবর ৯৬৩ হিজরী মোতাবেক ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দ থেকে কমরী বা চান্দ্র সনটিকে শামসী বা সৌর সনে পরিবর্তন করে নেন। তাই আমাদের কথিত বাংলা সনটি মূলতঃ হিজরী চান্দ্র ও সৌর সনের মিলনে সৃষ্ট। শুধু চান্দ্র হিসাবে বর্তমানে হিজরী সন হল ১৪১৩ এবং শুধু সৌর হিসাবে ১৩৭২ সাল। ১৫৫৬ সালে চান্দ্র বৎসর সৌর বৎসরের সঙ্গে মিলিত হওয়ায় ১৪০০ সাল হয়েছে।

উল্লেখ্য যে; এই হিজরী কমরী ও শামসী সনে ভারতীয় পদ্ধতিতে তারকা কেন্দ্রিক মাস ব্যবহৃত হয়ে আসছে। যেমন বৈশাখ মাস বিশাখা নক্ষত্র থেকে। চৈত্র মাস চিত্রা নক্ষত্র থেকে সৃষ্ট। এখানে এও উল্লেখ্য যে, মাস শব্দের অর্থ চাঁদ। প্রথমদিকে মানুষ চাঁদ দিয়ে তারিখ গণনা করত বলে এর নাম হয়েছে মাস। আজো হিন্দু এবং বৌদ্ধরা চাঁদের হিসাবে ধর্মীয় অনুষ্ঠান করে থাকে। অষ্টমী, নবমী, দশমী, একাদশী চাঁদের হিসাব। বৈশাখী পূর্ণিমা আষাঢ়ী পূর্ণিমাও চাঁদ দ্বারাই চিহ্নিত।

অনেকে সূর্য দ্বারা হিসাবকে অইসলামী মনে করে থাকে। আসলে তা ঠিক নয়। পবিত্র কোরআন বলে, চন্দ্র এবং সূর্য দিয়ে মানুষ 'আদাদাস্ সিনীন' বা সন বা বৎসর গণনা করে থাকে। অতএব, এই দুই পদ্ধতিই ইসলামী। আমাদের অধুনা বাংলা সনে এই উভয় পদ্ধতির মিলন ঘটেছে। আমরা রোযা, হজ্জ ইত্যাদির তারিখ নির্ণয় করি চাঁদ দ্বারা আবার ইফতার করি, নামায পড়ি সূর্যের হিসাবে। অতএব দু'টিই ইসলামী পদ্ধতি। অতএব, বাংলা সন অর্থ হিজরী কমরী শামসী সন।

(নির্বাহী সম্পাদক)

কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণার প্রার্থনা সংক্রান্ত রীট পিটিশন খারিজ

"ইত্তেফাক রিপোর্ট ।। গতকাল (বৃহস্পতিবার) সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ কাদিয়ানী সম্প্রদায়কে অমুসলিম হিসেবে ঘোষণার উদ্দেশ্যে সরকারকে আইন প্রণয়নের নির্দেশ দান সংক্রান্ত রীট পিটিশন সরাসরি খারিজ করিয়া দিয়াছেন। সুপ্রীম কোর্টের অন্যতম প্রবীণ আইনজীবী আলহাজ্ব এবি এম নুরুল ইসলাম রীট পিটিশনটি পেশ করেন। তিনদিন ধরিয়া শুনানির পর বিচারপতি মোহাম্মদ আবদুল জলিল ও বিচারপতি মোহাম্মদ ফজলুল করিম সমন্বয়ে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চ রীট পিটিশনটি খারিজ করিয়া এক রায় দান করেন।

আলহাজ্ব এবি এম নুরুল ইসলাম নিজেই নিবেদন পেশ করেন। সরকারের পক্ষে ছিলেন ডিপুটি এটর্নী জেনারেল এ,কে, মুজিবুর রহমান"।

(দৈনিক ইত্তেফাক-এর ১৬-৪-৯৩ তারিখের পত্রিকার সৌজন্যে)

আহ্‌মদী

30th April, 1993 রেজিঃ নং-ডি, এ-১২

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ ইমাম মাহ্‌দী মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তাঁর "আইয়ামুস সুলেহ্" পুস্তকে বলিতেছেনঃ

"আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতা'লা ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই এবং সৈয়্যদনা হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসূল এবং খাতামুল আম্বিয়া। আমরা ঈমান রাখি যে, ফিরিশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহ্‌তা'লা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরী'অত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামা'তকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলায়হিমুস সালাম) এবং কিতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতা'লা এবং তাঁহার রসূল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্যসমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুযুর্গানের 'ইজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামা'তের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাযেবীনা ওয়াল মুফতারিয়ীনা—"

অর্থাৎ সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী ও মিথ্যারোপকারীদিগের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত।

(আইয়ামুস সুলাহ্ পৃঃ ৮৬-৮৭)

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহ্‌মদীয়া আর্ট প্রেস, ৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
দূরালাপনীঃ ৫০১৩৭৯, ৫০২২৯৫

সম্পাদক ঃ মকবুল আহমদ খান
নির্বাহী সম্পাদক ঃ আলহাজ এ, টি, চৌধুরী

Published & Printed by Mohammad F.K. Molla at Ahmadiyya Art Press for the p oprietors, Ahmadiyya Muslim Jamat, Bangladesh
4, Bakshibazar Road, Dhaka-1211
Phone : 501379, 502295

Editor : Moqbul Ahmad Khan
Executive Editor : Alhaj A. T. Chowdhury